بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে শুরু করছি

যিনি অসীম দয়ালু, অকৃপন করুণাময়

※

প্রশান্তির খোঁজে

প্রশান্তির খোঁজে

মূলঃ উস্তাদ নোমান আলী খান

ভাষান্তরঃ নোমান আলী খান বাংলা

বুকিশ পাবলিশার

নামঃ প্রশান্তির খোঁজে

মূলঃ উস্তাদ নোমান আলী খান

গ্রন্থস্বত্ব © NAK BANGLA

প্রচ্ছদ ডিজাইনঃ ইফতেখারুল ইসলাম ইফাত

প্রথম সংস্করণ প্রকাশঃ

একুশে ফেব্রুয়ারী বইমেলা, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ। ১৪৪০ হিজরী। ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।

www.facebook.com/bookishpublisher/

www.bookishpublisher.wordpress.com

মূল্যঃ ২৩০ টাকা (নির্ধারিত), ভারতীয় রুপিঃ ২৪৫

যোগাযোগঃ +01645261821

এই গ্রন্থের স্বত্ব সংরক্ষিত। পরিশ্রমকারীদের কষ্টার্জিত কপিরাইট। নাকবাংলা ও প্রকাশনীর অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পূনঃপ্রকাশ নাকবাংলা ও প্রকাশনীর কষ্টের বিপরীতে নৈতিকভাবে পাপ ও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, আইনীভাবে অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। কেউ করতে চাইলে নাকবাংলা ও প্রকাশনীর স্ট্যান্ডার্ড অনুমতি লাগবে। কপিরাইটকৃত বই যেকোনো অবৈধ উপায়ে কেনা থেকে বিরত থাকুন, সৃজনশীলতাকে মূল্যায়ন করুন। তবে দাওয়াতী কাজে এর কোনো বিশেষ অংশ বা আর্টিকেল কেউ চাইলে ব্যবহার করতে পারবে উপযুক্ত রেফারেন্সসহ। ধন্যবাদ।

বুকিশ পাবলিশার , আরামবাগ, ঢাকা

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা দয়াময় আল্লাহর। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠানো নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর। আরো শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার, সাহাবা আজমাইন ও সালফে-সালেহীনদের ওপর।

এই বইটি আপনাকে আল-কুর'আনের বাণীর সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিবে। চিন্তার দুয়ারকে প্রসারিত করবে। আমলের প্রশান্তিকে বৃদ্ধি করবে ইন শাআ আল্লাহ। আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের সমন্বয়ে যিনি আল্লাহর কালামকে বাস্তবতার সাথে তুলে ধরেন, বের করে আনেন এর সৌন্দর্য, একে তুলে ধরেন জীবন্তরূপে, যার সূরা আল-কাহাফের অনলাইন ওয়েবিনারে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৯০টিরও বেশি দেশ থেকে সরাসরি অংশ নেন, যার স্টোরি নাইট (আল-কুর'আনের গল্পরাত) একবার শুনে বখে যাওয়া সন্তান কেবল আল্লাহর কালাম নিয়েই পড়ে থাকে, যার লেকচার শুনে অমুসলিম ই-মেইলে বলেন "আল্লাহ সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ" - তিনিই উস্তাদ নোমান আলী খান।

বৈশ্বিক ভাষা হিসেবে তিনি ইংরেজিতে আল্লাহর কালামকে এতো দূরে নিয়ে গিয়েছেন যে আল- কুর'আনকে জানার ও আরবী ভাষা শেখার রীতিমতো আন্দোলন শুরু হয়েছে তাঁর শিক্ষাগুলো নিয়ে। যিনি একসময় নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন আর এখন তার যৌক্তিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমন্বয়ের নিশ্ছিদ্র শিক্ষাগুলো পেয়ে লাখ লাখ তরুণ যুবক-যুবতী, সেক্যুলার, নাস্তিক ও আধুনিক-মনন থেকে ফিরে পাচ্ছে ফিতরাতী জীবন, আল্লাহর প্রশান্তিময় জীবনব্যবস্থা ইসলাম।

বাংলাভাষায় উস্তাদের সেই আল-কুর'আনের সহজ অথচ গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন কাজগুলো প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দবোধ করছি। মূল কাজগুলো করেছেনে NAK-BANGLA টিম এবং তাদের সম্মানিত কর্মীবৃন্দ। তাদের অসামান্য পরিশ্রমকে আল্লাহ তা'য়ালা যেন কবুল করেন ও উত্তমরূপে সেগুলোকে বৃদ্ধি করে দেন বহুগুণে।

আমাদের জন্য দো'আ করবেন যেন পরবর্তীতে আরো ভিন্ন ভিন্ন রত্ন উপহার দিতে পারি এই পথ চলায়...।

আহমাদ আল-সাবা, বুকিশ পাবলিশার, একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১৯

পাঠকের অনুভূতি

মাশাআল্লাহ! কষ্ট আর হতাশার মাঝেও উস্তাদ সবসময় জাগরণের আলো পৌঁছে দেন আমাদের কাছে। তিনি তরুণদের যেভাবে উৎসাহিত করেন সেটা সত্যিই চমকপ্রদ। উনি দুনিয়া আর আখিরাতের উপর ভারসাম্যপূর্ণ যে বক্তব্য দেন তা বরাবরের মতই আকৃষ্ট করে সারা দুনিয়ার মানুষকে। আল্লাহ উনার মত প্রশংসনীয় আর ব্যতিক্রমী চোখ দিয়ে ইসলাম ও দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারা মানুষ আরো তৈরি করে দিন, সে দো'আ করি। আল্লাহ উস্তাদের নেক হায়াত দান করুন!

- আবু ইউসুফ সুমন

আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ রহমতে বহু ইসলামিক স্কলারের লেকচার শোনার বা লেখা পড়ার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্। তবে এর মধ্যে নোমান আলী খানের লেকচার আমার মনের মাঝে উচ্চতম স্থান দখল করে আছে। কারণ তার বক্তব্যগুলো বর্তমান প্রেক্ষাপটের সমসাময়িক, যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়, এবং আমার বিশ্বাস, শুধু আমি নই, আজকের এই কঠিন সময়ে আমরা যে সব ফিতনার মুখোমুখি হচ্ছি, বা যে সব পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছি এর প্রতিটি বিষয়ের মোকাবিলা করার প্রেরণা আমরা তার লেকচারে পাই। আলহামদুলিল্লাহ্!! আল্লাহ্ তাঁকে হায়াতে তায়্যিবাহ্ দান করুন, তার এই নেক কাজ-এর উত্তম জাযাহ্ দিন।

- ফাইযুন নাহার

The way he explains the verses of the Quran, anyone can understand. Anyone can go deeper and feel the meaning of the Book of Allah. By listening to his lectures, really helped me to come closer to Islam & understand it better. May Allah grant him good health and long Hayat.

- Rasheda Choudhury

উস্তাদের দেওয়া প্রত্যেকটি উদাহরণ বাস্তব ঘটনার আলোকে; যা আমাকে আরো বেশি ইবাদাতে তৃপ্তি এনে দিয়েছে, ইসলামকে বাস্তব জীবনে পূর্ণঙ্গ অনুশীলনের দায়িত্বানুভুতি জাগ্রত করেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

- মো. মেহেদি হাসান

সূচিবয়ন

আমাদের যাত্রার কথা... ..... ১৪

উস্তাদ নোমান আলী খানের জীবনী ১৬

ইসলাম

আমরা মুসলিম, কিন্তু কেনো?..... ২৮

ইসলামের অপরিহার্য বিষয়াবলি..... ৩২

ডাকুন আপনার রবের পথে ৬০

ইসলামের নিরন্তর পরিপূর্ণতা ৬৪

ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক শয়তানের পথভ্রষ্টতার পলিসি এবং আমরা ৭১

ধর্ম সম্পর্কে না জেনে কথা বলা ৭৭

দরদ: আল্লাহর রাসূলের এক অসাধারণ গুণ..... ৭৫

তিনি যেমন পৃথিবী দেখতে চেয়েছিলেনঃ ইসলাম ও বর্ণবাদ ৮৪

ঈমান

স্থায়ীভাবে অন্তরের প্রশান্তি অর্জন ৮৮

দৃঢ় প্রত্যয়ী মুসলিমের দুইটি অসামান্য উদাহরণ..... ৯১

যেভাবে শিরকের দরজা খুলে যায় ৯৪

আল্লাহ

অন্তহীন শূন্যতাঃ সমাধান কী?.....৯৭

"আর রাহমান" – যিনি আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন.....১০০

আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক.....১০৪

আল্লাহর উপর ভরসা ধরে রাখা.....১০৭

আল্লাহর কাছে কী চাইবো?.....১১০

ইবাদত

আমরা কেন ইবাদত করি?.....১১৭

আল্লাহর জন্য সুসজ্জিত হোন.....১২১

আমি মুসলিম অথচ ঠিকমতো নামাজ পড়তে পারি না.....১২৪

'আলহামদুলিল্লাহ' এর আসল অর্থ কী?.....১২৯

আপনার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত ও শয়তানের শয়তানি.....১৩৩

চলাফেরায় বিনয় ও ভদ্রতা.....১৩৬

আখিরাত

মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রমাণ.....১৪২

পৃথিবীঃ আমাদের দ্বিতীয় জীবন.....১৪৪

একটি সাংঘর্ষিক অনুভূতি.....১৪৯

সময়.....১৫৩

আখিরাতের জন্য পরিকল্পনা করা.....১৫৬

জীবনের উদ্দেশ্য..... ১৫৯

আধ্যাত্মিকতা

আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশুদ্ধি..... ১৬২

ইসলাম ও আত্ম-অহংকার..... ১৬৯

মানসিক শান্তির সন্ধানে..... ১৯৮

কুর'আনের দৃষ্টিতে সব দেখা..... ২০২

আল্লাহর রাস্তায় অগ্রসর হও..... ২০৪

গুনাহ হয়ে গেল, এরপর? ২০৮

আল্লাহর কাছে কীভাবে ক্ষমা চাইবেন?..... ২০৯

মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগের আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি . ২১২

মুসলিম ডেভেলপমেন্ট

শ্রেষ্ঠত্বের সাধনা..... ২১৫

প্রাইভেট সেক্টর এবং একাডেমিয়ার গুরুত্ব ২৩৯

মনের অসহিষ্ণুতাঃ আল্লাহর দেয়া প্রতিবিধান..... ২৪৩

যখন আপনি নিজেকে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবেন..... ২৫৬

পরিশিষ্টঃ ১ ..... ২৬২

বাইয়্যিনাহ টিভি কি?

পরিশিষ্ট – ২ ..... ২৭০

যেখানে উস্তাদ নোমান আলী খানের কাজগুলো পাওয়া যাবে

আমাদের যাত্রার কথা...

উস্তাদ নোমান আলী খানের নাম প্রথম শুনি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই। তখন গ্রামীণ ফোনের এক জিবি ইন্টারনেটের যুগ। ভিডিও না দেখলে ব্রাউজ করে ১ জিবি ডাটা তখন শেষ করা যাবে না আমরা বলতাম। হাই স্প্রিড ইন্টারনেট তখনও সহজলভ্য হয়নি। পেনড্রাইভ করে ভিডিও লেকচার আনা নেওয়াই ছিল সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। এক ভাই থেকে অনেক লেকচার নিয়ে ভর্তি করলাম পেনড্রাইভ। খুলে দেখলাম নতুন একজন বক্তা, নোমান আলী খান। শোনা হয়নি তখনও।

অনেকদিন পর ভাবলাম, দেখি একবার সুযোগ দেয়া যাক। প্রথমেই শুনলাম 'Islam and Ego' (ইসলাম ও আত্ম-অহংকার) লেকচারটি। হাত-পা যেন অবশ করে দিলো। মনে হচ্ছিলো প্রতিটি কথাই আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে। চুম্বকের মতো আটকে গেলাম। এরপর, একের পর এক শুনতেই লাগলাম। কুর'আন এক বিস্ময়কর গ্রন্থ তা আগে কেবল শুনেছি কিন্তু তাঁর মাধ্যমে প্রথম এসব বিস্ময়ের ধরণ, রূপ ও প্রকারগুলো জেনেছি। অনুভব করেছি হৃদয়ের আচ্ছন্নতা দিয়ে। ব্যক্তিগতভাগে আশাতীত উপকৃত হয়েছি ওসব লেকচার থেকে।

স্বাভাবিকভাবেই সকলের ইচ্ছে থাকে এরকম ব্যক্তিত্বের লেকচারে সরাসরি উপস্থিত থেকে লেকচার শোনার। আল্লাহর অশেষ রহমতে এ সুযোগটি আসলো ২০১৪ তে, ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখ এর সুইটজারল্যান্ড হলে। ভিডিওতে লেকচার শুনা আর সরাসরি লেকচার শুনার তফাৎ আরেকবার বুঝতে পারলাম। লেকচার শেষে জুরিখ লেইকের আশে পাশে চিন্তিত অবস্থায় ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম - কিভাবে তার কথা গুলো বাংলাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়? লেইকে ঘুরতে ঘুরতে ভাবনাটি শেয়ার করলাম বন্ধুদের সাথে। দেখলাম তাদেরও একি চিন্তা। প্রাথমিকভাবে শুধু ভিডিওতে বাংলা সাবটাইটেল বসাবো, এটাতে

সবাই রাজি হলাম। খোলা হলো ফেইসবুক পেইজ। এরপর থেকে শুধুই বারাকাহ। আমাদের প্রচেস্টা ছিল খুবই অল্প কিন্তু আল্লাহর বারাকাহ ছিল অনেক বেশি।

এরপর না চাইতেই পেয়ে যাই আরো দক্ষ কিছু ভাই-বোন। সময়ের সাথে যোগ হয় বহু সেচ্ছাসেবী অনুবাদক ভাই-বোন। কাজের পরিধি শুধু বাড়তেই থাকে। এরপর আমরা একে একে ডাবিং এ চলে আসি।

এক ভাই বিনামূল্যে আমাদের www.nakbangla.com ওয়েবসাইটটি করে দেন। অনুবাদ, সাব-টাইটেল ভিডিও, ডাবিং এবং সাইট হয়ে গেলো আলহামদুলিল্লাহ। এরপর কি হতে পারে? সকলের মাথায় আসলো বই এর কথা। আমরা আলহামদুলিল্লাহ গত বছর **'বন্ধন'** বইটি বের করি। বই এর সফলতা দেখে আমরা চিন্তা করলাম প্রতি বছর একটি করে বই বের করা যায় কিনা। এই চিন্তার ফসল আজকের এই **"প্রশান্তির খোঁজেঃ উস্তাদ নোমান আলী খান সংকলন – ১"** বইটির ধারাবাহিকতা। বইতে কয়েকটি আর্টিকেল অন্য আলেম ও দাঈদের। আমাদের পেইজে সেগুলোর কাজ হয়েছিলো বলে গুরুত্বের কারণে সেগুলোও বইতে অন্তর্ভুক্ত করেছি। নির্ধারিত জায়গায় তাদের নাম উল্লেখ আছে। তাদের জন্যও দো'আ করবেন।

প্রতিটি বই একেকটি দলীল হয়ে কালের সাক্ষী হিসেবে থাকে। স্পর্শ পায় পারিবারিক ও বন্ধু-বান্ধবদের। সে ছোঁয়ায় থাকে ভালোবাসা ও হেদায়াতের পরশ। আমাদের প্রতিটি বই যেন এরকম ভালোবাসা ও হেদায়াতের স্পর্শ থাকে,সেই দো'আ চাই।

উস্তাদ নোমান আলী খান, নাকবাংলা এডমিনবৃন্দ, ডাবার, অনুবাদক ভাই-বোনসহ যারাই এ কাজে অংশগ্রহণ করে এগিয়ে নিচ্ছে সকলের জন্য দো'আ করবেন।

বিনীত

নোমান আলী খান বাংলা

উস্তাদ নোমান আলী খানের জীবনী

"কুর'আন তার সৌন্দর্যে চিত্তবিমোহনকারী; শব্দের দিক থেকে বিমোহকারী; বাণীর দিক থেকে প্রবলতর শক্তিশালী; সঙ্গতি ও ঐকতানের দিক থেকে মন্ত্রমুগ্ধকারী এবং সূক্ষাতিসূক্ষের দিক থেকে আশ্চর্যতর"।

- উস্তাদ নোমান আলী খান

উস্তাদ নোমান আলী খান আল-কুর'আনের শব্দচয়ন, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য সারা বিশ্বেই বেশ বিখ্যাত। আয়াতে বাক্যের ধরণ-গঠন, রূপক-উপমা, একটি সূরার সাথে অন্য সূরার সঙ্গতি ও সেতুবন্ধন নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরেন যা সূরাসমূহ পড়ার দিকে আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় অত্যন্ত উৎসাহের সাথে। আল-কুর'আনের গভীর আয়াত অথচ অত্যন্ত সহজভাবে বিশ্লেষণের জন্য তিনি বেশ সুনিপুণ পরিচয় দিয়েছেন। যার প্রমাণ তাঁর লেকচারে দর্কশকদের অত্যধিক আগ্রহোদ্দীপক আনাগোনা দেখে খুব সহজেই অনুমিত হয়।

তাঁর মাধ্যমে ইংরেজিতে আল-কুর'আনের ভাষাগত মুজিযার আলোচনা বর্তমান তরুণদের কাছে অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাঁর কুর'আনের আলোচনা এতটাই প্রিয়তর যে সরাসরি অনলাইন ওয়েবিনারে বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের ৯০টিরও অধিক দেশের লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কুর'আনের বিস্ময়কর শৈল্পিক সৌন্দর্য উপস্থাপনার জন্যে তিনি বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের মুসলিম তরুণ প্রজন্মের কাছে এক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। কুর'আনের শব্দচয়ন কতটা সৃজনশীল, ভাষা কতটা মনোমুগ্ধকর, অর্থ কতটা যৌক্তিক হতে

পারে – এগুলোই উস্তাদ নোমান আলী খানের চিন্তাভাবনা ও আলোচনার বিষয়। তাঁর বক্তব্যে কুর'আনের অন্তর্গত সৌন্দর্য ও মুজিযা মানুষের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনার ও অনলাইনে তাঁর বক্তব্য শুনে অসংখ্য মানুষ ইসলামের দিকে ফিরে আসছে এবং ইসলাম গ্রহণ করছে। তিনি প্রায় ২০টিরও অধিক তাফসীর-গ্রন্থ পাঠ করেছেন; সাথে আরো কিতাবাদি গবেষণা করে মোট ৩৫টিরও ওপরে রেফারেন্স নিয়ে একটি আয়াত পাঠ করে আমাদের সামনে তাঁর আল-কুর'আনের গভীর অথচ সহজ শিক্ষাগুলো তুলে ধরেন। ফলে কুর'আন নাযিলের ইতিহাস, শব্দচয়নের কারণ, ভাষার অলঙ্কার, অর্থের গভীরতা, যুক্তির প্রখরতা এবং ব্যাকরণগত শুদ্ধতার বিষয়গুলো তাঁর আলোচনায় ফুটে উঠে অতি সহজেই। তাই অনেক ইসলামী স্কলার নোমান আলী খানকে আল কুর'আনের ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এছাড়াও জন এস্পোসিটো সম্পাদিত বিশ্বের ৫০০ প্রভাবশালী মুসলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের তালিকায়ও তাঁর স্থান অন্যতম।

এ মানুষটি জন্মগ্রহণ করেন জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহরে। কিন্তু শিশু নোমান সেখানে ছয় মাসও থাকেননি। তাঁর বাবা পাকিস্তান দূতাবাসে কাজ করতেন বলে পরিবারসহ ছয় মাস বয়সে তাঁকে পাকিস্তানে চলে আসতে হয়। এখানেও তাঁর পরিবার দু'মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি; চলে যান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় রিয়াদে অবস্থিত একটি পাকিস্তানি উর্দু মিডিয়াম স্কুলে। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ছয় বছর তাঁর পরিবার রিয়াদে অবস্থান করেন। এরপর তাঁরা চলে যান আমেরিকায়। সেখানে তিনি খ্রিষ্টানদের পরিচালিত একটি হাইস্কুলে ভর্তি হন। ফলে নতুন পরিবেশে সবকিছুই তাঁর কাছে ভিন্ন মনে হলো। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পরিবেশ। বন্ধুরা সব ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন সংস্কৃতি লালন করে এবং চলে-ফিরেও ভিন্নভাবে। এই পরিবেশে নিজের অসহায়ত্ব আবিষ্কার করেন তিনি। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত তিনি কোনো মুসলিমের দেখা

পাননি। শুক্রবারে ক্লাস থাকায় দু'বছর তিনি জুমার সালাতও পড়তে পারেননি। অথচ তখন তিনি হাইস্কুলের ছাত্র।

তাঁর বন্ধুদের আচার-আচরণের মধ্যে নৈতিকতা ও ধর্মের কোনো ছোঁয়া ছিল না। ফলে তিনিও ধীরে ধীরে তাদের আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাকে বাধা দেয়ার কেউ ছিল না; এমনকি তার পরিবারও না। একসময় তাঁর মাঝে প্রবল অপরাধবোধ জেগে উঠে। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। হয় তাকে ধর্ম ত্যাগ করতে হবে, না হয় স্কুল ত্যাগ করতে হবে। তার দুর্ভাগ্য ছিলো যে অন্য কোথাও ভালো স্কুল নেই বলে তার পরিবার তাকে স্কুলও ত্যাগ করতে দেয়নি। স্কুল শেষে তিনি কলেজে ভর্তি হলেন। আগের মতোই বন্ধুদের সাথে চলাফেরা। এবার তিনি নাস্তিক হয়ে গেলেন। প্রায় দু'বছর তিনি নাস্তিকতার চর্চা করেন ও নাস্তিক তাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের লেখাজোঁখা পড়ে ফেলেন। ইসলাম থেকে তখন তিনি অনেক অনেক দূরে চলে গেলেন।

সময় হলো ফিরে আসার। নোমান আলী খান ইসলামে ফিরে আসলেন আগের চেয়ে শতগুণ গতিতে। হঠাৎ একদিন আমেরিকান মুসলিম স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের (MSA) দু'জন সদস্যের সাথে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কুর'আনের আলোচনা করছিলেন; কিছুটা তফাতে থেকে তিনি তা শুনছিলেন। যদিও এসব ধর্ম-কর্মের আলাপ তার কাছে তখন ভালো লাগত না। তারা নিজেরাই নোমান আলী খানের সাথে পরিচিত হলেন এবং ছায়ার মতো তার সাথে চলাফেরা শুরু করলেন। তবে তারা কখনো সরাসরি নোমান আলী খানকে কুর'আন পড়তে কিংবা সালাত আদায় করতে বলেননি। এমনকি কখনো ইসলামের দাওয়াতও দেননি। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তারা নোমান আলী খানের সাথে সময় কাটাতে লাগলেন। এতেই নোমান আলী খানের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়।

একদিন তাদের একজন নোমান আলী খানের সামনে সালাত পড়লেন। নোমান আলী খানের কাছে খুব খারাপ লাগলো। কারণ, তিনি সালাতের অনেক কিছুই ভুলে গেছেন গত দু'বছরের নাস্তিকতার কারণে; এমনকি মাগরিবের নামাজ কয়

রাকাত তা-ও তিনি ভুলে গেছেন। নিজের অজান্তেই তিনি মুসলিম স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের এ দু'জন ভাইকে বন্ধু ভাবতে লাগলেন। এবং তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তার অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়তে থাকে।

তিনি কুর'আনের অনুবাদ পড়া শুরু করলেন। আল্লামা ইউসুফ আলীর ইংরেজি অনুবাদ পড়তে লাগলেন। কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে কুর'আন বোঝা খুবই কষ্টকর মনে হলো। কোথায় বাক্যের শুরু আর কোথায় বাক্যের শেষ এসব কিছুই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। আল্লাহ হঠাৎ করে কেনো এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যান - এসব কিছু তিনি অনুবাদ পড়ে উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। তখন তিনি ভালোভাবে কুর'আন বোঝার জন্যে গুগল সার্চ করতে লাগলেন। ইন্টারনেটে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচুর লেকচার পেলেন। কিন্তু কুর'আনের ধারাবাহিক পাঠ বোঝার মতো কোনো আলোচনা তখনো তিনি পাননি যা তাকে কুর'আনের প্রতি আকৃষ্ট করে ধরে রাখবে।

কুর'আনের ধারাবাহিক আলোচনা প্রথম তিনি শুনেন তাঁর কমিউনিটির একটি মসজিদে। মাহে রামাদান মাস উপলক্ষে সে মসজিদে পাকিস্তান থেকে একজন আলেম আসেন। তাঁর নাম ইমাম ডক্টর আব্দুস সামি। তিনি প্রতিদিন এক পারা করে কুর'আনের অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত তাফসির করতেন। সকালে দুই ঘণ্টা, বিকালে চার ঘণ্টা এবং তারাবির পর রাত ১০টা পর্যন্ত কুর'আনের ধারাবাহিক আলোচনা হতো। নোমান আলী খান ডক্টর আব্দুস সামি-র সকল আলোচনায় অংশ নেন। এভাবে তিনি সম্পূর্ণ কুর'আনের তাফসীর শুনে শেষ করেন। কুর'আনের এই ধারাবাহিক আলোচনা শুনে তাঁর কাছে মনে হয়েছে – 'তিনি যেন এবারই প্রথম আল- কুর'আন শুনছেন'। এতে কুর'আনের প্রতি তাঁর ভীষণ আগ্রহ জন্মে। তিনি তাঁর উস্তাদ ডক্টর আব্দুস সামিকে বলেনঃ

'আপনি যেভাবে তাফসীর করেছেন, আমিও সেভাবে তাফসীর করতে চাই'।

ডক্টর আব্দুস সামি তাঁকে বললেন – 'তাহলে আগে আরবী শেখো'। নোমান আলী খান বললেন – 'আমি থাকি নিউইয়র্কে, সারাদিন কাজ থাকে, কলেজে যেতে হয়, আমি কিভাবে সৌদি আরব গিয়ে আরবী শিখবো?' ডক্টর আব্দুস সামি (এখনও জীবিত আছেন) তাকে বললেন – 'তুমি আগামী সপ্তাহ থেকে এ মসজিদে আমার আরবী ক্লাসে আসতে পারো'। এভাবে তিনি ডক্টর আব্দুস সামির কাছে আরবী শেখা শুরু করেন।

পরবর্তীতে তিনি ডক্টর আব্দুস সামির ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করে বলেনঃ

> **"আমি তার কাছে গিয়ে কুর'আন তাফসির শুনতাম। আমার জীবনে এরকম কুর'আনের জীবন্ত আলোচনা আমি আর পূর্বে কখনো শুনিনি। তাঁর আলোচনা শুনে মনে হতো এই বুঝি এখনি আমার উপর কুর'আন নাযিল হচ্ছে, আমারই বিভিন্ন বিষয়ে। এতটাই জীবন্ত ছিল আল্লাহর বাণীর যেসব আলোচনা"।**

এই তাফসিরই তাকে আরবী শেখার দিকে উৎসাহিত করে, আল্লাহর দিকে গভীরভাবে ফিরে আসতে সহায়তাস্বরূপ কাজ করে।

তিনি আরবী ব্যাকরণ শিখেন পাকিস্তানে। সেখানে তিনি ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় জাতীয় পর্যায়ের মেধা তালিকায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে স্থান দখল করেন। কিন্তু আরবীতে তার গভীর পড়াশোনা শুরু হয় ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ডক্টর আব্দুস সামি-র তত্বাবধানে। ডক্টর আব্দুস সামি পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের কুর'আন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, যিনি মাঝে মাঝে আমেরিকাতে যেতেন আরবী শিক্ষাদান এবং কুর'আনের তাফসিরের উপরে বক্তব্য রাখতে। তার অধীনে পড়াশুনায় নোমান আলী খান আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের উপরে তীক্ষ্ম এবং গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ডক্টর আব্দুস সামির কাছে আরো উপকৃত হন তার সম্পূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আত্মস্থ করে। তিনি ডক্টর সামির করা কাজগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তার নিজের ছাত্রদের উপকারের জন্য এবং তার প্রতিষ্ঠিত বাইয়্যিনাহ ইন্সটিটিউটে পড়াতেন।

আরবী শেখারত অবস্থায় তিনি ইন্টারনেটে খুঁজতে খুঁজতে একদিন পেয়ে গেলেন ড. তারিক আল-সোয়াইদানের কুর'আনের মুজিযা বিষয়ক প্রায় ১৫ ঘণ্টার একটি ভিডিও সিরিজ আলোচনা। এটি ছিল আরবীতে। তিনি রাতদিন এগুলো শুনতে থাকলেন, কিন্তু তেমন কিছুই বুঝতেন না। পরে সম্পূর্ণ লেকচারটা লিখে ফেললেন। অভিধান থেকে প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বের করলেন। এভাবে আস্তে আস্তে তিনি আরবী লেকচার বুঝতে শুরু করলেন। আমরা যে উস্তাদের ভাষাগত মুজিযা নিয়ে প্রচুর কাজ দেখি সেগুলোর অনুপ্রেরণা ড. তারিক আল-সোয়াইদান থেকেই।

এর কিছুদিন পর তিনি ইন্টারনেটে পেলেন মিশরের ইমাম মুতওয়াল্লী আল-শারাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)-কে। তাঁর আল-কুর'আনের বাস্তবিক ও জীবনঘনিষ্ঠ আধুনিক তাফসির উস্তাদ নোমান আলী খানকে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করে। আল- কুর'আন এতোটা সহজ সহজ, আধুনিক ও জীবনঘনিষ্ঠ হতে পারে তার উদাহরণ এই আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ড মুফতির তাফসির থেকেই তিনি পান।

এরপর পেলেন কুর'আনের উপর লেখা ড. ফাদেল সালেহ আল সামারাইয়ের বিভিন্ন বই ও বক্তৃতা। এগুলো পেয়ে তাঁর কাছে মনে হলো তিনি জ্ঞানের সাগর পেয়ে গেছেন। তিনি এসব পড়তে ও শুনতে শুরু করলেন। উস্তাদের আল-কুর'আনের যে সূক্ষাতিসূক্ষ বর্ণনা ও বিভিন্ন শব্দের অনুপম বিশ্লেষণ পাই সেগুলোর অনেকটা তিনি ইনার থেকে পেয়েছেন। এখন বৃদ্ধ ও জীবিত আছেন। ইনি ইরাকের অধিবাসী।

পাকিস্তানের মহিলা আলেমা ফরহাত হাশমি থেকে আল-কুর'আনের শব্দে শব্দে তাফসির পড়েন পুরোটা।

পাকিস্তানের আরকজন বিখ্যাত মুফাসসির ডা. এসরার আহমাদের তাফসিরের প্রতি ভালোবাসাটি ছিলো আরেক প্রিয়তা। এসরার আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাফসির করতেন ২০টি তাফসির থেকে। উস্তাদ নোমান আলী খান যখনই

কোনো আয়াত বুঝে উঠতে ব্যর্থ হতেন তখনই এসরার আহমাদের তাফসির খুলে দেখলে যেন আল্লাহ উপলব্ধির দুয়ার খুলে দিতেন।

হাদীস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বর্তমানে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও রিজালশাস্ত্রবিদ ড. শাইখ আকরাম নাদভী থেকে।

এভাবে তিনি একের পর এক স্কলারদের আবিষ্কার করলেন আর তাঁদের থেকে জ্ঞান আহরণ করতে থাকলেন। দিনের পর দিন পরিশ্রম করলেন। নিজেকে নিজে বারবার বাধ্য করলেন – যেভাবেই হোক আরবী শিখতে হবে, আরবী বুঝতে হবে। মানুষ যা চায় তা পায়। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নোমান আলী খান আরবী ভাষা ও কুর'আনের ওপর অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। চমৎকার উপস্থাপনা, যুক্তিযুক্ত কথা, সহজ-সরল পদ্ধতির কারণে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ আজ কুর'আন শেখার জন্যে তাঁর কাছে ভিড় করছে। কেবল অনলাইনে বর্তমানে ১০ হাজারেরও বেশি তরুণ তাঁর কাছে আল-কুর'আন ও আরবী ভাষা শিখছে এবং গত বিশ বছর ধরে চলছে তাঁর আল-কুর'আন শেখা ও শেখানো।

বর্তমানে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আবাসিকভাবে ইনটেন্সিভ এরাবিক ও আল-কুর'আন শেখানোর কাজে নিজেকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত রেখেছেন বাইয়্যিনাহ ইন্সটিটিউটে।

আরবী ভাষায় কুর'আন উপলব্ধির ব্যাপারে তিনি বলেনঃ

> **"কুর'আনের এই অলৌকিকতার মাঝেই যে অনিন্দ্য হেদায়েত রয়েছে তা শুধু কুর'আনের অনুবাদ পড়ে কোনোভাবেই আহরণ করা সম্ভব নয়। কারণ অনুবাদের আসতে পারে কিছুটা বার্তা কিন্তু আল্লাহর অলৌকিকত্ব ও তাঁর বাণীর যে গভীরতা সেটা কোনোভাবেই আসে না"**

তিনি সিদ্ধান্ত নেন – যত কষ্ট করে তিনি ইসলাম ও কুর'আন শিখেছেন ততটা কষ্ট যাতে অন্য কোনো মুসলিমের করতে না হয়। সেজন্যে তিনি অনলাইনে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৫ সালে তিনি

বাইয়্যিনাহ ইন্সটিটিউট (Bayyinah Institute) নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন এবং বাইয়্যিনাহ টিভি (Bayyinah.tv) নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেন। এই সাইটে কুর'আনের সৌন্দর্য, আরবী ভাষা শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাসের উপর বর্তমানে পাঁচ শতাধিক ভিডিও ক্লাস রয়েছে।

মূলত দু'টি উদ্দেশ্যে তিনি এসব কাজ করছেন।

প্রথমত, মানুষের জন্যে আরবী ভাষাকে একেবারে সহজ করে তোলা; যাতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে যেকেউ ইচ্ছা করলেই আরবী ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠতে পারে। তিনি বাইয়্যিনাহ টিভিতে চমৎকার সব কৌশলে মানুষকে আরবী শেখান। যেহেতু উস্তাদ অনেক সংগ্রাম করে আরবী শিখেছেন, তাই তিনি জানেন কীভাবে শেখালে মানুষ তাড়াতাড়ি আরবী ভাষায় দক্ষ হতে পারে।

তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো – মানুষকে কুর'আনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। তাঁর বিশ্বাস, মানুষকে আগে আরবী শেখানের ভয় দেখালে সে কখনো কুর'আনের স্বাদ নিতে পারবে না। তাই মানুষকে আগে কুর'আনের স্বাদ পাইয়ে দিতে হবে। তারপর মানুষ নিজ থেকেই আরবী শিখতে চাইবে, যেমনটি স্বয়ং তাঁর নিজের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তিনি মনে করেন, তাঁর মতো লক্ষ লক্ষ তরুণ দিশেহারা হয়ে আছে। তাদের কাছে একবার যদি কুর'আনের মুজিযা তুলে ধরা যায়, তাহলে তাদের জীবনই পরিবর্তন হয়ে যাবে।

অনেকে অভিযোগ করে, আধুনিক তরুণরা কুর'আন পড়ে না, এরা আরবী পড়তে চায় না। নোমান আলী খান এমন অভিযোগ করেন না। তাঁর কথা হলোঃ

> **"আমরা যদি তরুণদের জন্যে আরবী ভাষাকে সহজ করে দিতে পারতাম, অবশ্যই তারা আরবী শিখতো। আমরা যদি কুর'আনকে তাদের কাছে সহজ ভাষায় পৌঁছে দিতে পারতাম, অবশ্যই তারা তা গ্রহণ করত। কারণ ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। সবাই বলে – আরবী ভাষা ও**

কুর'আন শেখার জন্যে আমার কাছে এসো; কিন্তু আমি নিজেই কুর'আন শেখানোর জন্যে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতে চাই"।

দীর্ঘদিন অযত্নে পড়ে থাকলে শক্তিশালী লোহাতেও মরিচা পড়ে ক্ষয়ে যায়। একজন মুসলমানের ঈমানের যত্ন না নিলে তেমনি অন্তরের উপরে প্রলেপ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যেতে থাকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস 'আত্মা'। একটা প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও আমাদের অনেকেই ইসলাম থেকে, আল্লাহর ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যায়। ফলে কোনো কাজেই শান্তি থাকে না, কোনো কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যায় না। জীবন তখন যেন ছন্নছাড়া হয়ে যায়। ফলে জীবনের প্রকৃত অর্থ হারিয়ে যায়।

এসব বিবেচনায় উস্তাদ নোমান আলী খানের লেকচারের মাঝে রয়েছে আত্মিক প্রশান্তির জ্ঞান, আল্লাহর দ্বীন উপলব্ধির সুন্দরতম দিক, যেগুলো জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক এবং অর্থপূর্ণ। ফলে এসব আলোচনার মাধ্যমে আমাদের আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ক্ষুদ্র আত্মা এক অন্যদিগন্তের খোঁজ পায়, আল্লাহর দিকে পুনরায় ফিরে আসার প্রেরণা যোগায়।

উস্তাদ নোমানের শিক্ষকতা পেশায় আগমনের একটি দারুণ অভিজ্ঞতা আছে। তিনি একবার কোথাও লেকচার দিচ্ছিলেন। তো সেখানে MIT (ম্যাসাচুয়েট ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, বিশ্বের টপলিস্টের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) এর একজন প্রফেসরও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লেকচার শোনার পর সেই প্রফেসর তাকে বলেন, আপনি একজন Natural Teacher, আপনার স্বভাবগত প্রকৃতিতে শিক্ষকতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এরপর তিনি এই উৎসাহপূর্ণ কথায় দারুণ প্রভাবিত হন এবং তাঁর প্রযুক্তির সম্পর্কিত চাকরি ছেড়ে দিয়ে পূর্ণরূপে শিক্ষকতা পেশায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন।

উস্তাদ নোমান আলী খানের অনন্য বিশেষত্ব কি?

দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই মনে হয় - এটা কেন এমন?, ওটা কেন অমন হয়?, কেন এসব এমন হয় না? সবকিছু এরকম কেন হয় টাইপের প্রশ্ন জাগে।

এটা নিশ্চিত যে এইসবের পরিষ্কার উত্তর আমাদের রব আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া জীবনবিধানে পরিষ্কারভাবেই আছে। কিন্তু সেগুলো কীভাবে বুঝতে হয়, সেগুলোর কারণ কী, কীভাবে মনের এই সময় ও প্রশ্নগুলোকে "চালনা" করতে হয় তা আমাদের মতো অধিকাংশ লোকের কাছেই অজানা। এসব প্রশ্নগুলোতে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আত্মিক বিশ্বাস যুক্ত রয়েছে; ফলে এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর যারা অমন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কিন্তু নোমান আলী খানের লেকচারে সেসবের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উত্তর রয়েছে বর্তমান বাস্তবিক জীবনের আলোকে। ফলে আমাদের মতো যুবকদের মনে জেগে ওঠা সাধারণ ও সমস্যামূলক অনেক জিজ্ঞাসার অসাধারণ সুন্দর সমাধান পাওয়া যায় উস্তাদের আল-কুর'আনের দৃষ্টির সব আলোচনায়।

আমাদের অনেকেরই জীবনের একটা বাস্তব অথচ অমসৃণ অভিজ্ঞতা হলো – সাধারণত কিশোর-তরুণরা গড়ে ওঠার সময়ে দ্বীন-ইসলামসংক্রান্ত প্রচুর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। হতে পারে সেটা পর্দা নিয়ে, কোনো সমালোচিত প্রশ্ন নিয়ে, ফিকহ অথবা ধর্মীয় তত্ত্ব-সংক্রান্ত প্রশ্ন, হয়তো কোনো অশ্লীল বিষয়কে কীভাবে হ্যাঁন্ডল করতে হবে তা নিয়ে, অথবা কীভাবে দান করতে হয়, নিয়্যাত কেমন থাকা উচিত - এরকম হাজারো প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছে করে। অথচ এই বিশ্বাসী তরুণ-তরুণীরা উত্তর না পেয়ে শেষে ভুল করতে থাকে। একদিন হয়তো তাদের ইচ্ছেটাই হারিয়ে যায়।

কুর'আনের স্বতঃস্ফূর্ত পড়াশোনা, ইসলামকে তরুণ প্রজন্মের কাছে সুন্দর করে উপস্থাপনার আয়োজন বাংলাদেশে ও সমাজে খুবই কম। এই অদ্ভুত অবস্থায় আমাদের মতো ছেলে-মেয়েদের জন্য অশেষ রহমত অনলাইনের রিসোর্সে পাওয়া বিভিন্ন আলেম ও দাঈরা - যারা তরুণ প্রজন্মের সাথে খোলামেলা আলাপ করেন, কীভাবে চিন্তা করতে হবে শেখান, কীভাবে ভাবতে হয় সেটা দেখান। আর সেগুলোর ভিডিও ইন্টারনেটে সহজলভ্য। এসবের মাঝে উস্তাদ নোমান আলী খান একজন অন্যতম শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ হিদায়াতের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা।

উস্তাদ নোমান আলী খানের বক্তব্যের সুন্দর দিক হলো, তিনি অতি সাধারণ আর সরল ভাষায় তরুণদের বোধগম্য হবার মতন করে বিষয়গুলো আলোচনা করেন। তার একেকটা লেকচার শোনার পর ওই বিষয়ক খটকা এবং প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না এবং দ্বীন পালন করার ব্যাপারে সন্দেহ ও অজুহাত থাকে না। এইটুকু বুঝতে হলে হয়তো আমাদেরকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়তে হতো। এই সহজ সরল অথচ গভীর ও বহুমুখী প্রজ্ঞার কারণে আমাদেরকে আল্লাহর বাণী আরো কাছে টানে, আল্লাহর দ্বীন পালনে নিজেদের আরো উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

উস্তাদ নিজেই একটি ঘটনা তুলে ধরেছিলেন যেখানে আল্লাহর বাণী আল-কুর'আন মাজীদের আলোচনায় তার অনন্যতা উঠে আসে। তিনি বলেন, অনেক মা তাদের সন্তানকে জোর করে তার লেকচার ও সেমিনারে পাঠান বা নিজে নিয়ে আসেন; যাতে করে তারা তার লেকচার শুনতে পারে ও ইসলামের পথে আসতে পারে। কিন্তু একবার যখন উস্তাদের কুর'আনের আলোচনা শুনে, এরপর অনেকেই আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছেন – আমি যেন এই জীবনে প্রথম আল্লাহর বাণী শুনলাম! এত গভীর ও অলৌকিকতার সাথে এর আগে আমি আর কখনোও শুনিনি। এরপর তারা নিজেরাই নিয়মিত ইসলামী সভা-সেমিনার ও পাঠগুলোতে নিজ থেকেই আসতো! কি অসাধারণ চমৎকার বর্ণনা হলে এইসব প্রায় বখে যাওয়া, ইসলামের প্রতি অনীহাপ্রবণ ছেলে-মেয়েরা নিজ ইচ্ছায় আসে ও অন্যদের নিয়ে আসে উস্তাদ নোমান আলী খানের সেমিনার ও লেকচার শুনতে!

মুসলিম উম্মাহর ব্যাপারে অন্যরা যেখানে কেবল অভিযোগ আর সমস্যা চিহ্নিত করে, সেখানে নোমান আলী দেখেন সম্ভাবনা ও স্বপ্নের দ্বার। তিনি তরুণদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা দেখতে পান। উম্মাহর ৭০ ভাগ তরুণকে যদি কেবল সঠিক অনুপ্রেরণা দেয়া যায়, তাঁর বিশ্বাস বিশ্বের চেহারাটাই পাল্টে যাবে। তিনি মনে করেন – মুসলিমদের দায়িত্ব হলো কেবল তরুণদের কাছে সহজ পদ্ধতিতে কুর'আনের বাণী পৌঁছে দেয়া; বাকি দায়িত্ব আল্লাহর। তিনিই সব করবেন। একই মাটিতে একই বৃষ্টির পানি পড়ার পরেও যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন ফুলের

জন্ম হয়, একই ওহী মানুষের কাছে পোঁছাতে পারলে সেরকম হাজার রকমের সম্ভাবনা ও পরিবর্তনের সূচনা হবে।

নোমান আলী খানের চিন্তাভাবনা সব তরুণদের জন্যেই। এ কারণেই সম্ভবত সারা পৃথিবীর তরুণরা নোমান আলী খানকে তাদের জন্যে আদর্শ মনে করে। তাঁর বক্তব্যগুলো সারা বিশ্বের তরুণদের কাছে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে, বিশ্বের নানা প্রান্তের তরুণরা তাদের নিজেদের ভাষায় নোমান আলী খানের বক্তব্যগুলো ভাষান্তরিত করছে। বাংলা ভাষায় তাঁর ১০০ টিরও অধিক বক্তৃতা ডাবিং, সাব-টাইটেল, অনেকগুলো নোট এবং আর্টিকেল পরিবেশন করেছে NAK Bangla টিম ও ওয়েবসাইট। আল- কুর'আনকে মানুষের সামনে জীবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে সত্যিই নোমান আলী খান এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং একটি একক প্রতিষ্ঠান।

তিনি তার আলোচনায় খুব কমই হাদীস আনেন। কেন এমনটা করেন তার ভিত্তিতে তিনি বলেনঃ আল-কুর'আনের প্রতিটি আয়াতের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও হেদায়াত এতটা গভীর ও বিস্তৃত যে প্রতিটি আয়াত নিয়েই অনেক দীর্ঘসময় পর্যন্ত আলোচনা করা যায়।

তবুও যদি হাদীস আনার প্রয়োজন হয় তিনি হাদীসগুলোকে মুহাদ্দিসদের কাছে পাঠিয়ে দেন যেন সেগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই-বাছাই করে দিতে পারেন এবং তার আলোচনায় বলতে পারেন।

ইতোপূর্বে পরিবার, সন্তান, পিতামাতা ইত্যাদি টপিকে ''বন্ধন'' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। উস্তাদ সেটা শুনে প্রশংসা করেছেন এবং আমাদেরকে কিছু সাজেশনও দিয়েছিলেন।

উস্তাদের জন্য এবং আমাদের জন্য দো'আ করবেন যেন এ পথ চলায় আমরা আরো দীর্ঘ পথ পারি দিতে পারি, আরো সুন্দরভাবে।

ইসলামের অপরিহার্য বিষয়াবলি

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

﴿তোমরা যারা ঈমান এনেছো তারা তোমাদের ওয়াদাসমূহ পূর্ণ কর।﴾ [সূরা মায়িদাঃ ১]

ইসলামের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখার অনেকগুলো স্তর আছে। এ স্তরগুলো বিভিন্ন সারিতে সাজানো। এর সবগুলোর মান এক নয়, যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার আর জাঁক-জমকপূর্ণ জিনিস এক মাপের নয়। একটা না হলে পৃথিবীর কারো চলবে না আবার অন্যটি সবার লাগে না, না থাকলেও সমস্যা নেই। এখন যে বিষয়টি নিয়ে জানবো সেটা আমার শিক্ষক শাইখ ডঃ আকরাম নাদভী থেকে জেনেছি। কয়েক বছর আগে আমি তার একটা আলোচনায় এটা প্রথম শুনি এবং আমার ধারণা ছিল যে আমি এই বিষয়ে ভালোই জানি এবং বুঝি। কিন্তু... সেই আলোচনা শোনার পর আমার মাঝে বোধ আসলো যে আমি আসলে এ বিষয়ে অনেক কিছুই জানি না; প্রায় পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিলো আমার চিন্তাধারার পথ। শাইখ আকরাম নাদভীর সেই আলোচনাটি সত্যিকারভাবেই আমাকে অনেক উপকৃত করেছিলো জীবনের পথ-পরিক্রমায়।

পূর্বে আমি মনে করতাম যে আমি যে যেহেতু আমি ধর্ম নিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে পড়ালেখা করছি এবং আল্লাহর কিতাব বোঝার চেষ্টা করছি, সে হিসেবে তো আমি কিছুটা জানি। কিন্তু আল্লাহ তার বিশেষ কিছু বান্দাকে বিভিন্ন বিষয় বোঝার এবং উপলব্ধি করার এমন রহমত ও ক্ষমতা দিয়েছেন যে তাদের দ্বীনের ব্যাখ্যা শোনার পরে আপনার-আমার মনে হবে যেন আমি আসলে এতদিন কিছুই জানি নাই। তারা যদি কোনো সাধারণ বিষয় নিয়েও আলাপ করে যেটা আপনার মতে

আপনি ভালোই জানেন, কিন্তু আলাপ শেষে আপনার মনে হবে এটা সত্যিই নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও আলোচনাটি অসাধারণ ছিল। সুবহানাল্লাহ! ইনশাআল্লাহ, আমি আপনাদের সাথে এইরকম কিছু বিষয়ের সারমর্ম নিয়ে আলাপ করবো যেগুলো আমার কাছে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে, অনেক উপকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

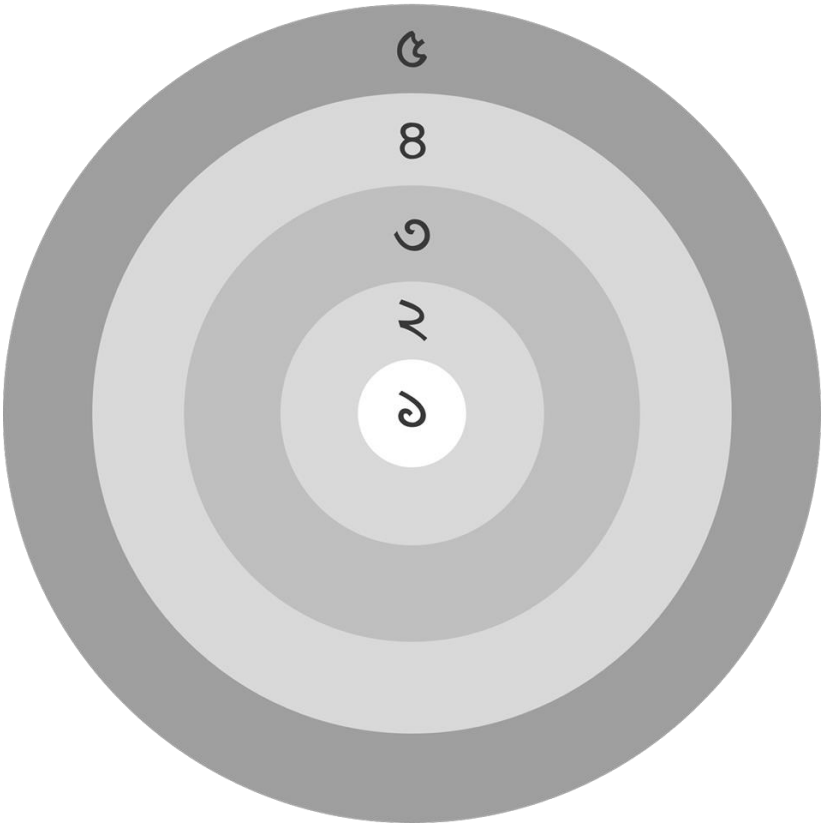

আপনারা যে গোলাকার বৃত্তটির ছবি দেখতে পাচ্ছেন সেটাই আপনাদের নিকট আজকের আলোচ্য বিষয়টিকে খুব সহজেই উপস্থাপন করছে। এখানে একদম ভিতরে একটি ছোট বৃত্ত, এর বাইরে আরেকটি বড় বৃত্ত, তার বাইরে আরো বড় একটি বৃত্ত, এর বাইরে আরো বড়, এভাবে...আরো বড়...আরো বড় হয়ে

ক্রমাগত একটি করে বৃত্ত চলেছে। এই ছবিটা নিয়েই আমরা কথা বলবো। মূলত, আমরা আমাদের ধর্ম ইসলামের বৃহত্তর, ধারাবাহিক ও ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ রূপ এই ছবি দিয়ে বুঝার চেষ্টা করবো ইন শাআ আল্লাহ।

একদম কেন্দ্রে, আমাদের ধর্মের মূলে যেটা রয়েছে (সবচেয়ে ছোট বৃত্তটি) সেটাকে আমরা বলতে পারি আমাদের দ্বীন এর 'উসূল', আমাদের ধর্মের মূল নির্যাস তথা মূলনীতি। অর্থাৎ আমাদের ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় নীতিমালা। অপরিহার্য বিষয়াবলি। মোটের উপর আমাদের ধর্ম হচ্ছে একগুচ্ছ নীতিমালার সমাহার। বিষয়টিকে আমরা এভাবে দেখতে পারি যে এসব নীতিমালা হচ্ছে সেটাই যা আল্লাহ একজন মানুষের কাছ থেকে চান।

আল্লাহ একজন মানবসন্তানের কাছ থেকে কী চান? কি ধরণের গুণাবলি, দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ, চিন্তা-চেতনা একজন বিশ্বাসী ঈমানদার মানুষের থাকা উচিত? আপনারা যদি এইসব অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কী কী জানতে চান, তবে দেখবেন আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুরআনে খুবই সুন্দর করে এগুলোর উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি এটা করেছেন لَعَلَّكُمْ ('লা 'আল্লাকুম') (যাতে তোমরা এই এই মূল বিষয় অর্জন করতে পারো...) শব্দটি ব্যবহার করে। যেমন বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনা করার পরে ঐ এতক্ষণ বর্ণিত বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে থাকেনঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'লা 'আল্লাকুম তাত্তাকুন' (যাতে তোমরা তাকওয়া বা আল্লাহর উপস্থিতি সদা-সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকুক এটা অর্জন করতে পারো। যেমন সূরা বাকারাহঃ ১৮৩), لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (লা 'আল্লাকুম তাশকুরুন) (পূর্বে বর্ণিত বিষয়টি এজন্য বর্ণনা করা হয়েছে যাতে তোমরা সেখান থেকে আল্লাহর শুকুর আদায় শিখতে পারো, এটাই তোমাদের জন্য এতসব বর্ণনার উদ্দেশ্য। যেমন সূরা রূমঃ ৪৬), لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (লা ''আল্লাকুম তাজাক্কারুন) (যাতে তোমরা আল্লাহক অধিক পরিমাণ স্মরণ করতে পারো বা চিন্তা করতে পারো পূর্বে বর্ণিত ঐ বিষয়ে, ওখানে চিন্তার অনেক খোরাক আছে। যেমন সূরা আরাফঃ ৫৭, সূরা নূরঃ ১), لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (লা 'আল্লাকুম তা'কিলুন) (যাতে তোমরা অন্ধ না হয়ে বরং নিজেদের আকল খাটাও...চিন্তা কর। যেমন সূরা

ইউসুফঃ ২) এরকম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ এসব উদ্দেশ্যের কথা তুলে ধরেছেন।

এভাবে প্রতিটি বর্ণিত বিষয়ের পর যখন উদ্দেশ্যস্বরূপ আসে 'যাতে করে তোমরা মনে রাখ,' 'যাতে করে তোমরা শোকরকারী হও,' 'যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার', 'যাতে করে তোমরা চিন্তা কর।' এসবগুলোই হচ্ছে মৌলিক গুণাবলি যা একজন মানুষের অবশ্য অবশ্যই থাকা উচিত। একজন মানুষের বিবেচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত, তার চিন্তাশীল হওয়া উচিত, তার সর্বদা আল্লাহকে স্মরণে রাখা উচিত, তার মধ্যে আল্লাহ-ভীতি থাকতে হবে, তাকে আল্লাহর প্রতি শোকরগুজার হওয়া উচিত। দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত একটি ঘটনা, নীতিকথা বর্ণনার পর বা আগে দেখবেন এসব গুচ্ছগুলো দিয়ে আল্লাহ ঐ বিষয়ের মূল উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করেছেন যে এইটুকু আমাদের অর্জনের জন্যই এতসব বলা।

আল্লাহ তা'য়ালা যখনই 'লা 'আল্লাকুম' বলেন এবং এই ধরণের কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেন, এর মানে তিনি বুঝতে চান এগুলো হচ্ছে সেইসব গুণাবলি যেগুলোকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। এইগুলো হচ্ছে আমাদের ধর্মের মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। আমি তখনই আল্লাহর একজন সফল বান্দা হতে পারবো যখন নিজের জীবনে এইসব গুণাবলির প্রতিফলন ঘটাতে পারবো, বাস্তবায়ন করতে পারবো আমার জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে। আমি এসব উপাদানের সবগুলোর তালিকা আপনাদের বলবো না, আপনারা কুরআন পড়ার সময় এগুলো অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। আমি শুধু অল্প কয়েকটি গুণাবলি উল্লেখ করবো। এগুলোর মধ্যে - **'লা 'আল্লাকুম তা'কিলুন'** – যাতে তোমরা সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করতে পারো, **'লা 'আল্লাকুম তাশকুরুন'** - যাতে করে তোমরা শোকরকারী বান্দা হও, **'লা 'আল্লাকুম তাজাক্কারুন'** - যাতে করে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো, **'লা 'আল্লাকুম তাত্তাকুন'** - যাতে করে তোমরা নিজেদের সমস্ত হারাম থেকে রক্ষা করতে পারো - বিপদ থেকে সতর্ক থাকতে পারো। এবং অবশ্যই **'লা 'আল্লাকুম তুফলিহুন'** - যাতে করে তোমরা পরকালে সফল হতে পারো। আপনারা জানেন, আল্লাহ প্রায়শই আল-কুর'আনে **'লা 'আল্লাকুম তুফলিহুন'**

বলেছেন। এগুলো হচ্ছে ইসলামের মূল ও মৌলিক কিছু গুণাবলি যা একজন খাঁটি বান্দা হিসেবে আল্লাহ আমাদের মধ্যে সর্বদা প্রতিফলিত দেখতে চান।

এসব ছাড়াও অন্য আরো একটা উপায়ে আল্লাহ আমাদের দ্বীনের 'উসূল' - অর্থাৎ 'আল্লাহ মানুষের কাছে কি চান?' বা একদম খাঁটি মূল বিষয়গুলোর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সেটা হচ্ছে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে - إِنَّ اللهَ يُحِبُّ **('ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বু') আল্লাহ অবশ্যই ভালোবাসেন...**[যেমন সূরা মায়িদাঃ ৪২] অথবা وَاللهُ يُحِبُّ **('ওয়াল্লাহু ইউহিব্বু')** - অর্থাৎ 'আল্লাহ ভালোবাসেন' [যেমন সূরা আলে-ইমরানঃ ১৪৮]। আল্লাহ **বলেন - 'আল্লাহ মুত্তাকিনদের ভালোবাসেন'** [সূরা আলে-ইমরানঃ ৭৬] **'আল্লাহ মুহসিনীনদের ভালোবাসেন'** [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৪৮]। এইভাবে আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুরআনে বিভিন্ন গুণাবলির মানুষদেরকে ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোই হচ্ছে সেইসব গুণ যেগুলো আমাদের জীবনে নিয়ে আসতে হবে, বাস্তবায়ন করতে হবে আল্লাহর একদম ভালোবাসার প্রিয় মানুষ হতে। এরকম অনেক আয়াত রয়েছে আল-কুর'আনে যেখানে নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে এসব গুণাবলি অর্জন করে আল্লাহর প্রিয় মানুষ হওয়া যায় এবং এগুলোই ইসলামের প্রথম মৌলিক উপাদান।

এবং সবশেষে আরো কিছু বাক্যাংশ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ **'ইন্নাল্লাহা মা আ'**, অর্থাৎ - আল্লাহ...সাথে আছেন (যেমন সূরা বাকারাহঃ ১৫৩)। এগুলোই ইসলামের প্রথম মৌলিক গুণাবলি যেগুলো আল্লাহ সর্বপ্রথম চান আমাদের থেকে – তাঁর খাঁটি ও একনিষ্ঠ বান্দা হওয়ার জন্য, সফল হওয়ার জন্য। এগুলোই ইসলামের অত্যাবশ্যকীয়, আবশ্যক ও অপরিহার্য উপাদান।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? আল্লাহ প্রথমে বলেছেন 'লা 'আল্লাকুম', (যাতে তোমরা এই... অর্জন করতে পারো), 'আল্লাহু ইউহিব্বু' – ('আল্লাহ ...ভালোবাসেন') এবং 'ইন্নাল্লাহা মা আ' (আল্লাহ সাথে আছে তাদের...)। 'মা আ' বলতে কি বুঝায়? সাথে। 'ইন্নাল্লাহা মা'আল মুহসিনীন', - 'আল্লাহ মুহসিনীনদের সাথে আছেন', 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেজগার এবং যারা সৎকর্ম করে।'। অর্থাৎ এই শব্দগুলো ব্যবহার করে আল্লাহ

যে গুণাবলির উল্লেখ করেছেন, এগুলোই হচ্ছে আমাদের দ্বীনের 'উসূল' – ইসলামের মৌলিক অর্জনীয় বিষয়াবলি।

মূলত এগুলোই হচ্ছে আমাদের ধর্মের নির্যাস। আমার দৃষ্টিতে এগুলো হচ্ছে আমাদের ধর্মের মূলনীতি বা মৌলিক নীতি – যেগুলো ছাড়া আসলে ধর্মটা একটা খোলসমাত্র। দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য থাকে এগুলো অর্জনের জন্য, এগুলোকে ঘিরে। আল্লাহ কুর'আনে সরাসরি এসবের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন।

এখন কথা হচ্ছে এই যে 'মূলনীতি', এটা কিন্তু দেখা যায় না। এটা একটা অদৃশ্যমান ধারণা। কারণ এগুলো গুণের নাম। মানুষের গুণ তো আর দেখা যায় না। অবশ্য কাজের মাধ্যমে গুণের প্রতিফলন ঘটে, তখন আমরা সেগুলো দেখতেও পাই। 'শোকরকারী হওয়া' - এর মানে কি?! 'তাকওয়া অর্জন করতে হবে', তাকওয়া বাড়াতে হবে...এসব তো অনেক শুনেছেন! কিন্তু তাকওয়া কী? এটা কি কিনতে পাওয়া যায়? বা আমি কি এমনকিছু খেতে পারি যা আমার তাকওয়া বৃদ্ধি করবে? আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার তাকওয়া কম বা বেশি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

একইভাবে, আমার ঈমান বাড়াতে হবে, তাওয়াক্কুল বাড়াতে হবে। এসবই হচ্ছে বিমূর্ত ধারণা – যা চোখে দৃশ্যমান নয়। আমরা কিভাবে এইসব বিষয়কে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিয়ে আসবো? কিভাবে আমরা এসব কাজ করবো, সেটাই হচ্ছে পরবর্তী (২য়) বৃত্তটি। অর্থাৎ প্রথমে আমরা ইসলামের মূল ও অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি জানলাম। এরপর এগুলো কীভাবে অর্জন করবো, কীভাবে সেগুলো আমরা বাস্তবভাবে পাবো সেসব কাজের কথা এসেছে। মূল গুণাবলি কীভাবে অর্জন করবো, সেই মাধ্যমগুলো কী কী সেগুলোই এই বৃত্তের বিষয়।

২য় বৃত্তটি হচ্ছে মৌলিক বাধ্যবাধকতা, মূল করণীয় এবং মূল বর্জনীয় কাজসমূহ। উদাহরণসরূপ: আমরা সবাই জানি যে আমাদের ধর্মের ৫ টি মূল স্তম্ভ আছে। সালাত এর মধ্যে একটি। সালাত হচ্ছে মৌলিক করণীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে (১ম বৃত্তে বর্ণিত) ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতিগুলোর

একটিকে পূরণ করা যায়, অর্জন করা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পূর্বে বর্ণিত মূলনীতিগুলোই কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আল্লাহ আমাদেরকে যেসব মৌলিক বাধ্যবাধকতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম বৃত্তে বর্ণিত অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতিগুলোকে সুদৃঢ় করা, বাস্তবায়ন করা, সেগুলো পাওয়া, অর্জন করা। যেমন ধরুন, আল্লাহ বলেছেনঃ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾**ওয়া আকিমুসসালাতা লি যিকরি'**﴿ - 'সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাতে করে তোমরা আমাকে স্মরণ করতে পারো' [সূরা তোয়াহাঃ ১৪]। আল্লাহকে স্মরণ করা কি একটি মৌলিক নীতি নয়? অবশ্যই! আল্লাহর স্মরণ ছাড়া তো দ্বীনই থাকে না। তাহলে আল্লাহর স্মরণকে আমরা কিভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিয়ে আসবো? এমন কি উপায়ে আমরা এটা করতে পারি যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে? এমনটি করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে সালাত। সালাত হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম যেটা আল্লাহকে স্মরণ করার বিমূর্ত ধারণাটিকে বাস্তবিক সত্যে রূপান্তরিত করে। নামাজেই আমরা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করি। প্রতিটি ধাপ পরিবর্তনে, প্রতিটি ধাপে থাকা অবস্থায় আমরা ক্রমাগতই আল্লাহর স্মরণ করি। এজন্য দেখবেন হাদীসে এসেছে, নামাজী ব্যক্তি আল্লাহর দিক থেকে মন ও চেহারা সরিয়ে নিলে আল্লাহও তাঁর রহমত সরিয়ে নেন। কারণ তখন মূল উদ্দেশ্য আর থাকছে না।

আবার দেখুন, সিয়াম পালন করার বিষয়ে আল্লাহ বলেনঃ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾**'কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন কাবলিকুম লা 'আল্লাকুম তাত্তাকুন'** ﴿ - 'তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, **যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো'** [সূরা বাকারাহঃ ১৮৩]। তাকওয়া হচ্ছে বিমূর্ত ধারণা। বাস্তবে এমন কি করা যেতে পারে যেটা তাকওয়ার এই বিমূর্ত ধারণাকে আমার জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত করবে? কি সেটা? সিয়াম পালন করা এই ধরণের কাজসমূহের একটি।

সিয়াম পালন করতে গিয়ে যেমন আমি আল্লাহর নির্ধারিত হারামকে বর্জন করি। কেউ দেখতে পাবে না এরকম জেনেও গোপনে খাবার খাই না। মিথ্যা বলা

থেকে রামাদানে বিরত থাকি। এসবই তো, অর্থাৎ সিয়াম আমাদেরকে মৌলিক গুণ অর্জন করতে অত্যাবশ্যকীয় বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে হিসেবে কাজ করছে। মিথ্যা বললেন মানে রোজা রাখা আর না রাখা একই হলো। কারণ সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত হারাম (মিথ্যা, গীবত, সুদ খাওয়া, অশ্লীল কিছু দেখা) থেকে বিরত রাখা।

এভাবে আপনারা দেখবেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি মৌলিক বাধ্যবাধকতা এক একটি মৌলিক নীতিকে সুদৃঢ় করে। অদৃশ্যমান মৌলিক নীতি অর্জন করতে দৃশ্যমান বাধ্যবাধকতার মৌলিক বিষয়গুলো (ইবাদত) পালন করতে হয়। বাধ্যবাধকতাগুলো দেয়া হয়েছে যাতে করে মৌলিক নীতিগুলিকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিয়ে আসতে পারি। মৌলিক উদ্দেশ্য যেন ছুটে না যায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা যা করেছি সেটা হচ্ছে, আমরা আল্লাহপ্রদত্ত এসব বাধ্যবাধকতাগুলোকে (ইবাদত) সংশ্লিষ্ট নীতিমালা (মৌলিক গুণাবলি) থেকে আলাদা করে ফেলেছি। এর ফলে যেটা হয়েছে, মানুষ ঠিকই সিয়াম পালন করছে কিন্তু তাদের মধ্যে এই বোধটি নেই যে সিয়াম পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া বৃদ্ধি করা। মানুষ সালাত আদায় করছে ঠিকই, কিন্তু তারা এই ব্যাপারে অবগত না যে সালাত আদায় করার কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।

এগুলো হচ্ছে মৌলিক বাধ্যবাধকতা, কেবল এই উদ্দেশ্যেই আমরা এইসব কাজ পালন করি না। ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় নীতিগুলোকে পূরণ করে আমাদের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানোর উদ্দেশ্যেই মূলত আমরা এইসব কাজ করি। সালাত পড়লেই সালাত আমাদের সফলতা দিবে না, যদি এর মাধ্যমে মৌলিক নীতির উদ্দেশ্য অর্জন করতে না পারি। সালাতের সাথে সম্পর্কিত যে মৌলিক নীতি সেটার সঠিক প্রতিফলনই সফলতা এনে দিবে। সালাত হচ্ছে একটা গন্তব্য বা ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছানোর একটা রাস্তা বা উপায়। আপনি নামাজ পড়লেন, কিন্তু অন্য গন্তব্যে চলে গেলেন তাহলে কি উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে? ঢাকার টিকেটে খুলনা গেলে কি আপনার মূল উদ্দেশ্যটি পূর্ণ হবে?

একইভাবে সিয়াম পালন করাও লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটা উপায়। আজকাল আমরা এইসব উপায় বা রাস্তাকেই আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করে ফেলেছি। একটি কোদাল কেনা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য থাকে না। কোদাল দিয়ে মাটি কাটাই প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য প্রতিটি ইবাদাতের মৌলিক উদ্দেশ্য রয়েছে, যেগুলো অর্জনই প্রতিটি ইবাদাতের উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্যগুলো প্রথম বৃত্তে দেখানো হয়েছে। অথচ আমরা প্রতিটি ইবাদাতের নিয়মকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলেছি যেরূপ কোদাল কেনাটাই যেন মূল উদ্দেশ্য! এই উপলব্ধিতে ভয়াবহ সমস্যা রয়েছে। কুর'আন কিন্তু আমাদের এরকম করতে দেয় না এবং করতে বলেও না। এজন্যই প্রতিটি বাধ্যবাধকতার কথাগুলোর সাথে সাথে সেগুলোর উদ্দেশ্যও বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি উপরে দেখেছি।

আল-কোরআনে যখনই কোনো বাধ্যবাধকতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তখনই সেই কাজের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ওই কাজ সম্পর্কিত মৌলিক নীতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমরাই এই দুইটা বিষয়কে আলাদা করে ফেলেছি।

এখানে আরকটি কথাও মনে রাখতে হবে যে, বাধ্যবাধকতা বলতে কিন্তু শুধু করণীয় কাজগুলোর কথাই বোঝানো হয় নি, বর্জনীয় কাজসমূহের কথাও বলা হয়েছে, অর্থাৎ সেসব কাজ আমাদের করা উচিত নয়। এর মানে হালাল ও হারাম উভয় ধরণের কাজই এ বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণসরূপঃ সালাত এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ **('তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার')** - (সালাত যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে) [সূরা আনকাবুতঃ ৪৫]। অশ্লীলতা আমাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি থেকে দূরে রাখে; আমাদের তাকওয়াবান, আল্লাহর শোকরকারী এবং বিনয়ী হতে বাধা দেয়। সালাত আমাদের এই অশ্লীলতা থেকে হেফাজত করে। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে সেইসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যেগুলো করলে ইসলামের মূলনীতিগুলোকে অমান্য করা হবে। প্রত্যেকটা নিষেধ একেকটা মূলনীতির সাথে জড়িত, দ্বীনের উসুলের সাথে সম্পর্কিত। সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে আমাদের ২য় বৃত্তঃ প্রধান প্রধান করণীয় এবং বর্জনীয়সমূহ। এই পর্যন্ত, অর্থাৎ এই দুইটি বৃত্তে

যেসব কিছু বলা হলো, এই বিষয়ে মোটামুটি সব আলেম-উলামা ও মুসলিমরাই একমত।

ইসলামের মূলনীতিগুলো কী কী এবং আমাদের মূল করণীয় ও বর্জনীয় কাজসমূহ কী কী, আমরা সবাই এই বিষয়ে একমত। কোনো মুসলিম এসে এইরকম বলবে না যে 'আমি আসলে নিশ্চিত না শূকর কি আসলেই হারাম কি না'। এইরকম কখনো হবে না। আর যদি কেউ এইরকম বলে থাকে তার মানে হচ্ছে সে জ্ঞানহীন মূর্খ। কারণ আমরা এ সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই জানি।

এবার চলুন এই দুই বৃত্তের বাইরে যে ৩য় বৃত্তটি সেটা বোঝার চেষ্টা করি। এই ৩য় বৃত্তটি হচ্ছে প্রধান বাধ্যবাধকতাগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট সুপারিশসমূহ বিষয়সমূহ (রিকমেন্ডেশন) নিয়ে আলোচনা। যেমন ধরুন, আমাদের মহানবীর সুন্নাহসমূহ; অথবা সেইসব ভালো কাজসমূহ যেগুলোর কথা আল-কুর'আনে উল্লেখ হয়েছে। এগুলো এমনসব কাজ যেগুলো আমাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করে। যেমনঃ নরমভাবে কথা বলা। আল-কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয়ে কথা বলেছেন।

অথবা ধরুন নম্রভাবে চলাফেরা করার ব্যাপারটা; এইগুলো হচ্ছে সেইসব কাজ যা আপনার চরিত্রকে উন্নত করবে। একইভাবে, ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা যা একটি সুন্নাহ। অথবা ধরুন, ডান হাত দিয়ে খাওয়া। এইসব ছোট ছোট কাজগুলো আমাদের উন্নত চরিত্রের বিকাশ ঘটায়। মূল কথা হলো, মানুষের প্রাধান্য দেয়া উচিত মৌলিক নীতিগুলোকে। আর সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য তাকে নজর দিতে হবে প্রধান প্রধান বাধ্যবাধকতার দিকে। এরপরের ধাপ হলো এটি।

যদি একজন ব্যক্তি প্রধান বাধ্যবাধকতাগুলো ঠিকভাবে মেনে চলতে পারে, তাহলে তার পরবর্তী চেষ্টা হওয়া উচিত ছোট ছোট সুপারিশগুলো পালন করার মাধ্যমে এই প্রধান আদেশ-নিষেধগুলোকে আরো সৌন্দর্যমন্ডিত করা। যেমন, সালাত হচ্ছে একটা প্রধান কাজ। সালাত এর পরে জিকির করাটা কি? এটা হচ্ছে উৎকর্ষ

সাধন। একইভাবে, সালাত এর পরে দো'আ করা একটা উৎকর্ষ সাধন। অর্থাৎ আপনি ইতোমধ্যে প্রধান কাজটি করে ফেলেছেন, এখন সেটাকে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করছেন।

এই যে ছোট ছোট ভালো কাজ করার মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন করার ধারণা, এটা নিয়েও কারো মধ্যে তেমন কোনো মতভেদ নেই। কিয়ামুল লাইল একটা ভালো কাজ। তাহাজ্জুদ এর সালাত আদায় করা একটা ভালো কাজ। ফরজ সিয়াম এর অতিরিক্ত সিয়াম পালন করা ভালো কাজ। ভ্রমণ কিংবা ঘরে প্রবেশের সময় দো'আ পড়া সবই ভালো কাজ। দো'আ না পড়ে ঘরে প্রবেশ করা হারাম নয়। অথবা দো'আ না পড়ে ভ্রমণ করাও কোনো হারাম বিষয় নয়। কিন্তু ওসবই কিন্তু ভালো কাজ, তাই নয় কি? এটা আপনার দ্বীনের উৎকর্ষ সাধন করে, আপনার জন্য কল্যাণকর। এইসব জিনিস আপনার জীবনকে উন্নত করে। এগুলো নিয়েই ৩য় বৃত্তটি।

কিন্তু চার নম্বর বৃত্তটিতে যাওয়ার আগে তিন নম্বর বৃত্তটি সম্পর্কে আরো কিছু বিষয় স্পষ্ট করা দরকার।

> *প্রথম এবং দ্বিতীয় বৃত্তে আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে মূলত সেইসব জিনিস যেগুলোর দিকে আমাদের নবীগণ দাওয়াত দিয়েছেন। অর্থাৎ নবীগণ আমাদেরকে ইসলামের প্রধান নীতিমালা, প্রধান করণীয় ও বর্জনীয় এইসবের দিকে ডেকেছেন। এগুলোই ছিল নবীদের দাওয়াতের মূল দিক। মানুষ যখন এসব মৌলিক বিষয়গুলো মেনে নিয়ে, ভালো করে বুঝে, আত্মস্থ করতে সক্ষম হলো, এর পরে গিয়ে নবীগণ তাদেরকে এসবের পাশাপাশি উৎকর্ষ সাধনের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ দিতেন।*

এখন দেখা যাক এসবের চিন্তা থেকে আমাদের ফারাক কতটুকু।

আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে, মৌলিক নীতিমালাগুলো তো আমরা ভুলেই গেছি, তার ওপর প্রধান বাধ্যবাধকতাগুলোকে (হালাল-হারাম) উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সব ছোটখাটো সুপারিশ আছে সেগুলোর সাথে মিশিয়ে গুলিয়ে ফেলেছি। এভাবে

আমরা যারা ইসলাম পালনের দিকে একটু বেশি মনোযোগী তাদের কাছে এই সম্পূর্ণ গুলিয়ে ফেলা মিশ্রণই যেন এখন প্রধান বিধি-নিষেধের বিষয় (বাধ্যবাধকতা) হয়ে গেছে। ফলে আমাদের বোঝের ইসলাম হয়ে গেছে গোলমেলে এবং অনেক সময় অন্যের সাথে এগুলো নিয়েই ঝামেলার সৃষ্টি হয়; দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ দ্বীনের উসূলের উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে পালন তো দূরের কথা।

যেমন আজকের দিনে অনেক মসজিদেই দেখবেন, কেউ হয়তো যোহর এর ফরজ সালাত আদায় করেছে কিন্তু সুন্নাত সালাত পড়েনি। আপনি তখন তার পেছনে লেগে যান এবং তাকে প্রশ্ন করেন 'কি করছেন আপনি? আপনি সুন্নাত নামাজ পড়েননি কেন'? অর্থাৎ আমরা মানুষকে উৎকর্ষসাধনমূলক কাজগুলো করার জন্য বল-প্রয়োগ করছি। মানুষ যদি এ কাজগুলো না করে তাহলে আমরা তাদের পেছনে লাগছি বাধ্যবাধকতা হিসেবে করানোর জন্য। অথচ হাদীসে স্পষ্ট আল্লাহর জন্য ফরজ নামাজের সময় হলে অন্য কোনো নামাজই নেই। কিন্তু আমরা তাদের নামাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলছি; তারা কি করছে, কি করেনি এইসব নিয়ে কথা বলছি। এখানে একটি হাদীস দেখতে পাই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাজদের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে আসলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম, কিন্তু সে কী বলছিল তা বুঝা যাচ্ছিলো না। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অতি নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। সে বললো, এ ছাড়া আমার কোনোকিছু (সালাত) আছে কি? তিনি বললেন, না তবে নফল আদায় করতে পারো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাত প্রদানের কথাও বললেন। সে জিজ্ঞেস করলো, এ ছাড়া আমার উপর আরো কোনো কর্তব্য আছে কি? তিনি বললেন, না। তবে নফল দান-সদকাহ করতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি এ কথা বলতে বলতে চলে গেল, ''আমি এর বেশিও করবো না, আর কমও করবো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি যদি তার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে

তাহলে সফলকাম হয়েছে। (সহীহ মুসলিমঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৮, ইসলামিক সেন্টারঃ ৮)

আবার যেমন ধরেন, আল-কুর'আনের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। এইটা কিন্তু ২য় বৃত্তের মধ্যেও নাই, এটা ৩য় বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আমরা কি করি? কারো তিলাওয়াত সহীহ না হলে আমরা বলি, 'তোমার তো সালাত হচ্ছে না, তিলাওয়াত করতে গিয়ে তো তুমি উল্টো গুনাহ করছ।' অথচ বিষয়টি অতোটা না। কুর'আন তিলাওয়াত করে আপনি কখনোই গুনাহর মধ্যে পড়ছেন না। আপনি অবশ্যই সহীহভাবে তিলাওয়াত শেখার চেষ্টা করবেন, ধীরে ধীরে উন্নতির চেষ্টা করবেন। কিন্তু আপনি যদি বসে বসে তাজবীদের মদ্দ, ক্বালকালা'র সময় ঐ ব্যক্তির তিলাওয়াত একদম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসেব করা শুরু করেন, তাহলে কেমন হবে বিষয়টা? সাহাবাগণ তো এভাবে শিখেন নি। আপনি অবশ্যই আপনার তাজবীদের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করবেন।

কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে এইসব জিনিস উৎকর্ষসাধনের জন্য, সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য। এগুলো ঘর সাজানোর উপাদানের মতো। আপনার বাসায় একটা দরজা থাকার দরকার আছে। আলো বাতাস প্রবেশের জন্য একটা জানালার দরকার আছে। কিন্তু আপনার বাসার জন্য স্পেশাল কার্পেট অত্যাবশ্যক নয়। দেয়ালে রঙ-বেরঙের পেইন্টিং থাকতেই হবে এমন নয়। এটা ঠিক যে একগুলো থাকলে ভালোই লাগে, সৌন্দর্য বাড়ে। একটা তুলতুলে সোফা থাকলে ভালোই লাগে। কিন্তু কারো বাসার দেয়ালে পেইন্টিং না থাকলে আপনি তাকে বলতে পারেন না যে, 'তোমার তো বাসা-ই নাই। পেইন্টিং না থাকলে আবার বাসা হয় নাকি'! আপনি এরকমটি করতে পারেন না।

এরকম করবেন না। কারণ অধিকাংশ মানুষই প্রধান বাধ্যবাধকতা এবং উৎকর্ষ-সাধনমূলক কাজগুলোর মধ্যে পার্থক্য করে না বা না জানার কারণে করতে পারে না। যার ফলে আপনি যখন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে এইরকম বলেন বা সমালোচনা করেন, মানুষজন সেই সমালোচনাকে গণহারে সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য মনে করে।

তারমানে আপনি যখন এরকম কিছু করেন, এর দ্বারা আপনি মানুষকে আল্লাহর দীন থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন।

উপরিক্ত ভুল চিন্তাভাবনার একটা ভয়াবহ পরিণতির উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদের। আমাদের মধ্যে একধরণের মানুষ আছেন যাদের মতে মোটামুটি সবকিছুই হারাম। এসব লোকেরা যেন প্রায় হারামের মেশিনে পরিণত হয়ে গিয়েছে। কেউ ভিডিও গেইম খেলছে, তারা বলবে ভিডিও গেইম হারাম। আপনি টিভি দেখছেন, এটা হারাম। রেডিও শুনছেন? এটাও হারাম! সবকিছুই হারাম আর হারাম। অথচ মূল ব্যাপারটা হচ্ছে, ২য় বৃত্তে বর্ণিত কিছু প্রধান বর্জনীয় কাজ রয়েছে, যেমন মদ, জেনা, হত্যা, নির্লজ্জতা ছড়ানো ইত্যাদি। এগুলো খুবই খারাপ এবং এগুলো ২য় বৃত্তের আওতায় পরে। আল্লাহ এগুলোকেই হারাম বলেছেন। আর এখন আপনি বলছেন ভিডিও গেইম হারাম। এইরকম বলার মাধ্যমে আপনি আল্লাহ যেসব কাজকে হারাম বলেছেন, আর আপনি নিজে যেসব কাজকে পছন্দ করেন না, এই উভয়কেই একই পাল্লায় মাপছেন।

এর ফলে একজন যুবক ভাই বা বোন যে মুভি দেখে; হতে পারে সেটা অর্থহীন কোনো মুভি বা যেকোনো কিছু, সেটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু যখন সে শুনবে মুভি দেখা হারাম, তখন সে চিন্তা করবে, 'এটা হারাম? কিন্তু আমি তো সারাক্ষণই মুভি দেখি। এটা যদি হারাম হয়, তাহলে তো আমি বিপদে আছি। আর যেহেতু আমি প্রচুর মুভি দেখি তার মানে আমি তো আসলেই অনেক বড় বিপদে আছি! আর বিপদে যখন আছি-ই অন্য হারামগুলোও তাহলে করি। দোজখে তো এমনিতেই যাওয়া লাগবে, তাহলে মৌজ-মাস্তি, পার্টি এসব করেই যাই।

এখন দেখুন বিষয়টি কেমন হচ্ছে। এই যে আপনি মদ, রেডিও শোনা ও ভিডিও গেইম এ সবকিছুকেই এক কাতারে ফেলেছেন; একজন পাপীর মনের মধ্যেও এসব এখন একই পাল্লায় বিচার হচ্ছে। সে ভাববে, ভিডিও গেইম কোনো ব্যাপার না। মুভি দেখাও কোনো ব্যাপার না। আর জেনাও কোনো ঘটনা না। সবই এক; মদ, নেশা, প্রেম-জেনা সবই সমান। তার মানে, আমরা তখনই সমাজে সমস্যা তৈরি করা শুরু করি যখন আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার

লিস্টকে ঠিক রাখি না, আমাদের চিন্তা দিয়ে সেগুলোকে গুলিয়ে মিশিয়ে ভেজাল মিশ্রণ করি। মানুষ মনে করে আমরা যত বেশি জিনিসকে হারাম হিসেবে লিস্ট করবো, এটা মানুষের জন্য ততোই ভালো হবে, মানুষকে রক্ষা করবে। অথচ বিষয়টি আমাদের ইখতিয়ারে নয়, জ্ঞানেও নয়। আমাদের মনে রাখা উচিত, আল্লাহর নবীগণ মানুষকে আমাদের চেয়ে আরো ভালোভাবে রক্ষা করেছেন। তাঁরা যা করেছেন, এর চেয়ে উন্নততর কিছু করার সামর্থ্য আমাদের নেই।

আমাদের সীমাবদ্ধতার ভেতরে থেকে 'ফিকহ' অবশ্যই বিচার করার চেষ্টা করবে যে কোনোকিছু কি আসলেই পরিষ্কারভাবে হারাম কি না, আমরা হারাম কিছু করছি কি না। এমন স্পষ্ট হারাম জিনিস অবশ্যই আমাদের সামনে আসতে পারে যেটার অস্তিত্ব আগে কখনো ছিল না। কিন্তু সেটা অবশ্যই বড় কোনো পাপ কাজের সাথে সম্পর্কিত হবে, অথবা আমাদের ধর্মের সেইসব মৌলিক নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কিছু একটা হতে হবে। অর্থাৎ ১ম ও ২য় বৃত্তের বিষয়গুলির সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

যাইহোক, ৩য় বৃত্তের বিষয় হচ্ছে উৎকর্ষসাধনমূলক কাজ-কর্ম। এসব কাজ-কর্মের মধ্যে আছে অতিরিক্ত সুন্নাত নামাজ পড়া, সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করা, কবর জিয়ারত করা, বাসায় ঢুকতে ও বের হতে বিভিন্ন দো'আ পড়া। এই যে এসব কাজ - এগুলো নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। আপনি যদি মৌলিক বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণ করার পরে আরো ভালো মুসলিম হতে চান সেটাতো খুবই ভালো। উৎকর্ষসাধনমূলক কাজগুলো করুন। প্রতিদিন একটু একটু করে ভালো কিছু শিখুন। একটা ছোট দো'আ শিখুন প্রতিদিন। এই ধরণের কিছুই করা উচিত। এখন, এই বৃত্তের ঠিক বাইরে আরেকটি বৃত্ত আছে। চার নম্বর বৃত্তটি।

চতুর্থ বৃত্তটি সেইসব বিষয় নিয়ে যেগুলো সম্পর্কে সাহাবীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যদিও আমরা এই বিষয়গুলো আল-কুর'আনে পাই না। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, যেসব উৎকর্ষসাধনমূলক কাজের কথা উপরে বলা হয়েছে সেসব কিন্তু আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ'তে স্পষ্টভাবেই বিদ্যমান। তার বাইরে এই যে চার নম্বর বৃত্তের কথা বলা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে সেসব বিষয়

যেগুলো নিয়ে সাহাবীগণ মতৈক্যে (ইজমা আস'সাহাবা) পৌঁছেছেন। কিন্তু বাস্তবে এমন বিষয় পাওয়া দুষ্কর যেটা নিয়ে সব সাহাবী একমত হয়েছেন। ব্যাপারটা অতোটা সহজ নয়। সাহাবীদের একমতের ধরণের উপরে নির্ভর করে মূলত তিন রকমের মতৈক্য রয়েছে।

প্রথমটি হচ্ছে, সাহাবীগণ কোনোও একটা ঘটনা নিয়ে একমত। সেটা কেমন? যেমন ধরুন, সব সাহাবীই কিন্তু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। অনেকেই বদর যুদ্ধের পরে মুসলিম হয়েছেন। কিন্তু যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা সকলেই একইভাবে বলবেন যে এই যুদ্ধ অমুক দিনে শুরু হয়েছিল, এতদিন ধরে চলেছে, আমাদের এইসব রসদ ছিল ইত্যাদি। কেন তারা সবাই একইরকম কথা বলবেন? কারণ তারা সবাই ওই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। একারণেই তারা এই বিষয়ে একমত।

দ্বিতীয় ধরণের ঐকমত্য হচ্ছে, সাহাবীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জ্ঞানী আলেম ছিলেন তাদের মধ্যে ঐকমত্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সবাই একে অপরের সাথে একমত পোষণ করতেন। যেমন ধরুন, ইবনে আব্বাস (রা), তিনি একজন আলেম সাহাবী ছিলেন। এমন অনেক সাহাবীও ছিলেন যারা একটা সূরাও পারতেন না। তারা সদ্য মুসলিম ছিলেন। তাদেরকেও আমরা সাহাবী বলি। কিন্তু তাদের ঐকমত্য এই দ্বিতীয় ধরণের ঐক্যমত্যের ভিতরে পড়ে না। এটা হচ্ছে সেই ধরণের ঐকমত্য যেখানে কোনো বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী ও আলেম সাহাবীগণই কেবল একমত হয়েছেন।

তাহলে প্রথম ওই ধরণের ঐকমত্য যেখানে সাহাবীগণ কোনো একটা ঘটনা নিয়ে একমত পোষণ করেন, যেহেতু তারা সবাই ওই ঘটনার অংশ ছিলেন। দ্বিতীয়টা হচ্ছে সেই ঐকমত্য যেখানে সাহাবীদের মধ্যে যারা জ্ঞানী আলেম তাঁরা কোনো বিষয়ে একমত হয়েছেন।

তৃতীয়টি হচ্ছে সাহাবীদের মধ্যে যারা শাসক তাদের মধ্যকার ঐকমত্য। যেমন ধরুন, ওমর (রা) এবং তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী। তাঁরা যখন কোনো একটা নিয়ম বা

বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন সেটা হচ্ছে এই তৃতীয় ধরণের ঐকমত্য। যখন শাসনকার্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন পড়তো, ওমর (রা) নিশ্চয়ই হাজার হাজার সাহাবীদের সবার সাথে আলোচনা করতেন না। তিনি তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীর সাথে বসে সবাই মিলে একমত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতেন। তারপর সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন হতো এবং এরপর সবাই সেটা মেনে চলতো।

এই হচ্ছে সাহাবীদের মধ্যকার তিন ধরণের ঐকমত্য। অর্থাৎ, ঘটনাভিত্তিক, জ্ঞানী আলেম-ভিত্তিক সাহাবী এবং শাসনকার্যে নিয়োজিত সাহাবী-ভিত্তিক ঐকমত্য।

এখন বর্তমান সময়ে এসে যে ঝামেলাটি হয় সেটা হচ্ছে, কেউ একজন যখন এইভাবে বলে যে, 'সব সাহাবীরা এই বিষয়ে একমত যে ...।'

-দাঁড়ান! দাঁড়ান! 'সব সাহাবীগণ একমত', এটা আপনি কোথায় পেলেন?

- কেন? এইভাবেই তো বর্ণনা করা আছে।

- কোথায় আছে?

- বই-পুস্তকে আছে।

- কোন বই? যাও ভাল করে পড়!

আপনি কোনোভাবেই এটা বলতে পারেন না যে 'সব সাহাবী একমত হয়েছিলেন ...'। আপনার কথা সুনির্দিষ্ট দলিলপত্রের ভিত্তিতে হতে হবে। এমনিতেই বলে ফেললে হবে না! সবচেয়ে হাস্যকর যে কথাটা আমি এখন পর্যন্ত শুনেছি সেটা হচ্ছে 'সব ইসলাম বিশারদ এই বিষয়ে একমত'।

- 'বলেন কি? ঠিক আছে, তাদের ১০ জনের নাম বলেন'।

- উমম..., সবাই।

আপনি যদি তাফসির পড়েন, তাহলে এমন একটি বিষয়ও পাবেন না যে বিষয়ে সব আলেম একমত হয়েছেন। এটা হাস্যকর! আমি বিভিন্ন তাফসির পড়ি যেমন কুরতুবি, তাবারি, জালালাইন, তাফসির ইবনে কাসির, ইবনে আ'শুর। একটা কথা যেটা প্রায়শই এসব তাফসিরে লেখা থাকে সেটা হচ্ছে '...আলেমগণ এই বিষয়ে একমত এবং এর ভিন্নমত একদমই বিরল।' অন্য আরেক মুফাসসির হয়তো এর উল্টোটি লিখেছেন যে, এই ভিন্নমতের বিষয়েই বরং আলেমগণ একমত, আর প্রথম মতের পক্ষে যুক্তি বিরল। অর্থাৎ, তাদের কাছেও এই একমত হওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক। এটা ঠিকভাবে বুঝার জন্য অনেক পড়াশোনা এবং গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। এমনও হয়েছে যে, সাহাবীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে জ্ঞানী তিনিও একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন, দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং এটা স্বাভাবিক!

> *দ্বীনের কোথায় সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য আছে? কোনো বিষয়ে কোনো প্রকার দ্বিমত নেই? প্রথম তিনটি বৃত্ত। প্রথম তিনটি বৃত্ত নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই! যখন আমরা মানুষকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেই, নবী-রাসূলদের পক্ষ থেকে আহ্বান জানাই, তখন আমরা মূলত কোন বিষয়ে কথা বলি? বৃত্ত নম্বর এক এবং দুই! যখন সেই মানুষগুলো আমাদের দলে চলে আসে, আমাদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, আমাদের বন্ধুমহলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং প্রথম দুইটি বৃত্তের বিষয়গুলোকে ইতোমধ্যেই মেনে নেয়; তখন আমরা কি করি? তখন আমরা তাদের তিন নম্বর বৃত্তের দিকে আগ্রহী করার চেষ্টা করি। এটাও প্রাধান্য-নীতি অনুযায়ী ধারাবাহিকতা।*

চার নম্বর বৃত্তের বিষয়সমূহ খুবই সুনির্দিষ্ট। এগুলো মূলত গবেষণা এবং উচ্চশিক্ষার জন্য। তাই আপনি চার নম্বর বৃত্তের বিষয়গুলো দিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করে সবাইকে এরকম বলতে পারেন না যে, 'শুনো সবাই, এটাই হচ্ছে ইসলাম।' আপনাকে শুরু করতে হবে মহানবী ﷺ যেখান থেকে শুরু করেছেন সেখান থেকে।

আপনাকে এক এবং দুই দিয়ে আল্লাহর দিকে ডাকা শুরু করতে হবে। তারপর তিন এর দিকে অগ্রসর হতে হবে। এরপর, এসবের বাইরে হচ্ছে চার নম্বর বৃত্তটি। এখন, সকল সাহাবী কি এই সবগুলো বিষয়ে একমত হয়েছিলেন? না! তবে তাঁরা সবাই এক থেকে তিন এই বিষয়গুলোতে সহমত পোষণ করেছেন। আপনারা যদি এটাকে ইজমা বলতে চান, অর্থাৎ সকল সাহাবী যেসব বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সেগুলো হচ্ছে এক, দুই এবং তিন এর বিষয়গুলো।

এখন এই চারটি বৃত্তের বাইরে আরো একটি বৃত্ত আছে এবং এটি হচ্ছে এই সব বৃত্তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ। এই বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সেইসব বিষয় যেগুলো নিয়ে বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একমত পোষণ করে। এটাকে আপনারা ইজতিহাদ বলতে পারেন। একজন স্কলারের নিজস্ব মতামত থাকে, যেটাকে আমরা ফতোয়া বলি। স্কলাররা কিভাবে চিন্তা করেন, এটা উপলব্ধি করতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা জানেন যে এক, দুই এবং তিন এগুলো হচ্ছে নিখুঁত। চার নম্বর বৃত্তের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কেন তাঁরা এই বিষয়ে একমত হয়েছিলেন অথবা দ্বিমত পোষণ করেছিলেন এটা বুঝার জন্য অনেক পড়ালেখা এবং গবেষণার প্রয়োজন।

এরপরে যখন পাঁচ নম্বর বৃত্তটি আসে, যেখানে এমন কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো সম্পর্কে কুরআনে সরাসরি কোনো সমাধান দেয়া হয় নি এবং হাদিসেও পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয় নি। এসব বিষয়ে একদম পরিষ্কার, নির্ভরযোগ্য ও শক্ত কোনো দলীল পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এরকম করা উচিত বা ঐরকম করা উচিত। এখন সমাধান পাওয়ার জন্য আমাকে আমার নিজের গবেষণা করতে হবে। দলীল, প্রমাণাদি যা কিছু পাওয়া যায় খুঁজে বের করতে হবে। এরপর আমার সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে এসবের ভিত্তিতে একটা সমাধানে আসতে হবে। তার মানে, আমি এই সমস্যার একটা সমাধান বের করার চেষ্টা করছি, **এটা মেনে নিয়ে যে** আমার প্রাপ্ত উত্তরটি একেবারে নিখুঁত হবে না। কারণ একদম নিখুঁত সমাধান এক, দুই এবং তিন এই বৃত্তগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তাই, এখানে এসে আমার প্রাপ্ত উত্তরটি হচ্ছে আমার সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে যতটুকু নিখুঁত হওয়া যায় ঠিক ততটুকু। **এটা এমন কোনো সমাধান নয় যেটা আমি অন্যের উপরে চাপিয়ে দিতে পারব।** আমি নিজে সেটা মেনে চলতে পারি এবং অন্যরা যদি আমার সমাধান খুঁজে পাওয়ার পদ্ধতিকে যুক্তিসংগত মনে করে তাহলে হয়তো তারা ও এই সমাধান অনুসরণ করবে। কিন্তু আমি এমন করে বলতে পারব না যে, 'এটাই ইসলাম এবং তোমরা যদি এটা অনুসরণ না কর তাহলে ইসলামের বাইরে চলে যাবে।' আমি এভাবে বলতে পারি না। আর আমি এটাও বলতে পারব না যে, আমার দেয়া ফতোয়া ইসলামের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বড়জোর আমি এরকম করে বলতে পারি যে, 'আমার জ্ঞান অনুসারে যতদূর বুঝতে পেরেছি, বিষয়টাকে আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি।' কারণ অন্য আরেকজনের এই একই বিষয় নিয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে। এসব হচ্ছে সেইসব বিষয় যেগুলোর বিষয়ে কুর'আন, হাদিস বা সাহাবীগণের পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট সমাধান পাওয়া যায় না।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ডঃ আকরাম নাদভী আমাদেরকে এই বিষয়ে শিক্ষাদানকালীন ১০০ টি উদাহরণ দিয়েছিলেন। যদিও ২টি উদাহরণ শোনার পরেই আমি অনেক আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম। যদিও পরবর্তীতে উনি আরো ৯৮ টি উদাহরণ দিয়েছিলেন। আমি মাত্র একটি উদাহরণই দেব, আমার সবচেয়ে পছন্দের উদাহরণগুলোর মধ্যে একটি।

খলিফা হারুন অর রশিদ, তিনি তখন রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন। আমির উল মু'মিনিন। সেই সময় আমির উল মু'মিনিন সালাতের ইমামতি করতেন। বিশেষ করে হজ্বের সময়। এরকম একসময় তিনি হজ্ব পালন করতে গিয়েছেন। তাহলে কে তখন ইমামতি করবেন? আমির উল মু'মিনিন হিসেবে তিনিই ইমামতি করবেন। যাইহোক, তিনি প্রথম কাতারে ছিলেন। কারণ তিনি ইমামতি করবেন। আর তিনি ছিলেন হানাফি মাজহাবের অনুসারী। উনার হজ্বের একজন মুয়াল্লিম ছিলেন। মুয়াল্লিম হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আপনাকে হজ্বের বিভিন্ন নিয়মকানুনগুলো সঠিকভাবে শিখিয়ে দেন। স্বাভাবিকভাবেই আমির উল মু'মিনিনের মুয়াল্লিমও

হানাফি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ছিলেন কাজী ইউসুফ, হানাফি মাজহাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইমাম আবু হানিফার সবকিছু উনিই লিপিবদ্ধ করতেন। যাইহোক, এই কাজী ইউসুফই ছিলেন আমির উল মু'মিনিনের মুয়াল্লিম।

পৃথিবীর বুকে হানাফি মাজহাবের সবচেয়ে বিজ্ঞ যে আলেম তিনি হচ্ছেন তাঁর মুয়াল্লিম! তাঁরা দুজনেই সামনের কাতারে আছেন এবং আমির উল মু'মিনিনের একটু পরেই সালাতের ইমামতি করার কথা। কিন্তু খলিফা হারুন অর রশিদ হিজামা করিয়েছেন। হিজামা হচ্ছে এমন একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যেটা কাপিং এর মাধ্যমে করা হয় এবং এর ফলে শরীর থেকে রক্ত বের হয়। এখন, হানাফি মাজহাব অনুসারে শরীর থেকে রক্ত বের হলে অজু নষ্ট হয়ে যাবে। খলিফা হারুন অর রশিদ একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি জানতেন যে তিনি যদি আবু ইউসুফকে এখন জিজ্ঞাসা করেন যে আমার অজু কি নষ্ট হয়েছে কি না, তাহলে আবু ইউসুফ কি বলবেন? বলবেন, হ্যাঁ, অজু নষ্ট হয়ে গেছে। আর সে ক্ষেত্রে তাঁকে এখন প্রথম কাতার থেকে বের হয়ে, সবগুলো কাতার পার হয়ে অজুখানায় গিয়ে অজু করতে হবে। এরপরে, আবার সেই পেছন থেকে প্রতিটি কাতারে বিভিন্ন মানুষজনের সাথে কুশল বিনিময় করতে করতে সামনের কাতারে ফেরত আসতে হবে। এই পুরো প্রক্রিয়াতে যে সময় লাগবে তাতে করে আসরের ওয়াক্ত পার হয়ে মাগরিবের সময় হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁকে তো তখনই সালাতের ইমামতি করতে হবে এবং তিনি যদি আবু ইউসুফকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে উনি বলবেন যে আপনার সালাত আদায় হবে না, কারণ আপনার অজু নেই!

ঘটনাচক্রে ইমাম মালিকও প্রথম কাতারে ছিলেন। এমতাবস্থায় খলিফা উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ওনার নিজের মুয়াল্লিমকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে জিজ্ঞেস করলেন ইমাম মালিককে। কারণ, মালিকি মাজহাব অনুসারে রক্তপাত হলেও অজু ভঙ্গ হয় না এবং খলিফা এটা জানতেন! তাই তিনি ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আমি যে হিজামা করার জন্য কাপিং করালাম, আমার অজু কি

নষ্ট হয়েছে? ইমাম মালিক বললেন, না না, আপনার অজু ভঙ্গ হয় নি; দয়া করে জামাতের ইমামতি করুন! ফলশ্রুতিতে খলিফা হারুন অর রশিদ ইমামতি করলেন হজ্বের সময়ের সেই বিশাল জামাতের! কাজী আবু ইউসুফ এবং ইমাম মালিক দুজনেই সেই জামাতে ওনার পেছনে ছিলেন।

আর কাজী ইউসুফ ছিলেন সেই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত স্কলারদের মধ্যে অন্যতম। যার কারণে তিনি একা হজ্বে আসেন নি, তাঁর সাথে অনেক শিক্ষার্থী ছিলেন যারাও হজ্ব করতে এসেছেন। সেই শিক্ষার্থীরা কিন্তু পেছনে ছিলেন, তারাও এই ঘটনা ঘটতে দেখলেন এবং নামাজ পড়ছিলেন। আর নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা দৌড়ে কাজী ইউসুফের কাছে গেলেন এবং বললেন, আমরা কি আবার সালাত আদায় করবো? আপনি কিভাবে ওনাকে কাবার সামনে অজু ছাড়া ইমামতি করতে দিলেন? তখন হানাফি মাজহাবের অনুসারী কাজী আবু ইউসুফ তাঁর শিক্ষার্থীদের বললেন – 'যে পুনরায় সালাত আদায়ের দুঃসাহস দেখাবে, সে খাওয়ারিজদের অন্তর্ভুক্ত। সে বা তাঁরা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

কেন তিনি এরকম বললেন?

কারণ ফতোয়া নিয়ে তাঁর চিন্তার প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন ছিল। ওনার চিন্তার প্রকৃতি এইরকম ছিল যে, রক্তপাত এর সাথে অজু নষ্ট হওয়ার বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নি। এটি এমন একটি বিষয় যেটা নিয়ে গবেষণা করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন আমাদের গবেষণা অনুসারে অজু নষ্ট হবে। আর ইমাম মালিকের গবেষণা অনুসারে অজু নষ্ট হবে না। এটা একান্তই আমাদের ব্যক্তিগত গবেষণার ফল। কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে বলা হয়েছে যে রক্তপাত হলে অজু নষ্ট হবে। আবার এমন কোনো হাদিসও নেই যেখানে বলা হয়েছে রক্তপাতের কারণে অজু নষ্ট হয়।

তাই আমরা কেউ-ই এই বিষয় নিয়ে তর্ক করতে পারি না যে আমার প্রাপ্ত ফলটিই সঠিক। কারণ এটা একান্তই আমার সীমিত জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত ব্যক্তিগত মতামত। যার ফলে আমি কিন্তু এটাও জানি না যে আমি সঠিক কিনা

আর এটাও জানি না যে উনি ভুল। আর এটা নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে আমি যে মূলনীতি জানি - 'ঐক্য হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি'। সেটাকে আমি বিসর্জন দিতে পারবো না। إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ('ইন্নামাল মু'মিনুনা ইখওয়া') - ' ﴿নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পরের ভাই﴾ । [সূরা হুজুরাতঃ ১০], يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - ﴿নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে (অন্যদেরকে) অগ্রাধিকার দান করে﴾ ('ইউসিরুনা আলা আনফুসিহিম ওয়া লাও কানা বিহিম খাসাসা') [সূরা হাশরঃ ৯]। এগুলো হচ্ছে ইসলামের মূলনীতি। নিজের ফতোয়ার প্রতি অনড় থাকতে গিয়ে আমি এই মূলনীতিকে অমান্য করতে রাজি নই।

এরকম ছিল তাদের চিন্তা ভাবনা। এভাবেই ওনারা বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতেন।

আপনি যদি ফিকাহ নিয়ে পড়াশোনা করেন তাহলে দেখবেন, সেখানে কেউ যখন অন্য আরেকজনের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন তখন শুরুতে তিনি যার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছেন তাঁর জন্য দোয়া করে এক পৃষ্ঠা লেখেন। এরপরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন কেন তিনি একমত নন।

একইভাবে অপরজন যখন এর উত্তর দিবেন, তখন তিনিও এইভাবে বলেন যে, আপনার দোয়ার জন্য ধন্যবাদ এবং আপনার জন্যও নিম্নোক্ত দোয়া রইল। আর এই হচ্ছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা যে কারণে আমি আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি।

যদিও তাঁরা যে সবসময় একে অপরের সাথে এরূপ ব্যবহার করেন এমন কিন্তু নয়। মাঝে মাঝে তাঁদের লেখার মধ্যে অন্যের প্রতি বিরূপ প্রকৃতির মনোভাব ও লক্ষ্য করা যায়।

যাইহোক, বর্তমান সময়ে ইসলামের যে রূপ সেটা বুঝার জন্য এই বৃত্তগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার আইডিয়া থাকা দরকার। বৃত্তগুলোর কথা মাথায় রেখে আমরা যদি চিন্তা করি, আমাদের কোন বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত? কোনটি সবার প্রথমে গণ্য হবে? অবশ্যই মূলনীতিসমূহ। মূলনীতিসমূহঃ স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার, আল্লাহ-ভীতি, সততা, আমানতদারিতা, ওয়াদা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি

সবার আগে আসবে। এই মূলনীতিগুলো আমরা কিভাবে শিখি? অত্যাবশ্যকীয় বাধ্যবাধকতাসমূহ পালন করার মাধ্যমে এই মূলনীতিগুলো আমাদের মধ্যে সুদৃঢ় হয়। আর কোন জিনিসটা এই মূলনীতিগুলোকে উন্নত করে? - তৃতীয় বৃত্তটি।

এখন যেটা দেখা যায়, বর্তমান সময়ে ইসলাম সম্পর্কিত আমাদের বেশিরভাগ জিজ্ঞাসাই প্রথম তিনটি বৃত্ত দূরে থাকে এমনকি চতুর্থ বৃত্তের মধ্যেও পড়ে না। আমাদের জিজ্ঞাসাগুলো পঞ্চম বৃত্তের মধ্যে চলে গেছে, মূলনীতিগুলোর ছিটেফোঁটাও যেখানে নেই।

আমরা যখন হজ্বে যাই, হজ্ব হচ্ছে একটা মৌলিক বাধ্যবাধকতা। হজ্ব পালনের মাধ্যমে আমাদের ভিতরের সব গুণাবলি সুদৃঢ় হওয়ার কথা। তাকওয়া, শোকর, আল্লাহ-ভীতি, সততা, ন্যায়বিচার এই সবকিছুই। এখন ইব্রাহিম (আঃ) এর সময় থেকে প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে আপনি যখন কাবার সামনে দাঁড়িয়ে 'কালো পাথরটিকে ধরার জন্য চেষ্টা করছেন, তখন দেখবেন আশপাশের মানুষজন আপনার মুখে তাদের কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে আপনাকে ঠেলে সরিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এমনও দেখবেন যে, কেউ একজন তার সামনের ৫/৬ জন মানুষের উপর দিয়ে উঠে গিয়ে সেই হাজারে আসওয়াদ ধরার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে; যেন তার অনেক মূল্যবান কিছু চাওয়ার আছে, দো'আ করতে হবে। কিন্তু এরকম উতলা হয়ে, যুদ্ধ করে হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌঁছানোর পরে একমাত্র যে দো'আটা তার করা উচিত সেটা হচ্ছে, হে আল্লাহ আমি এইমাত্র যেসব গুনাহ করে এই পর্যন্ত আসলাম তার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আমরা রীতিনীতিগুলো ঠিকই মেনে চলছি, কিন্তু তার মধ্যে মূলনীতিগুলোর কোনো উপস্থিতি নেই।

আল-কুরআনে আল্লাহ সেসব মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন যারা পবিত্র থাকতে ভালোবাসে [সূরা বাকারাহঃ ২২২]। হজ্বে আপনারা পবিত্র মুজদালিফায় যাবেন। এটা এমন এক জায়গা যেখানে আপনি সারারাত আল্লাহর কাছে দো'আ করে কাটানোর কথা। আল্লাহর স্মরণে রাত পার করার কথা। কিন্তু সকালে আপনি যখন সেখান থেকে রওয়ানা দিবেন, আপনি এমনকি দুই কদমও সামনে যেতে

পারবেন না। আপনি চিন্তায় পড়ে যাবেন যে আপনি কি একটা পবিত্র জায়গায় আছেন, নাকি একটা আস্তাকুঁড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আপানি নিচে তাকিয়ে মাটি দেখতে পাবেন না। শুধু দেখবেন, ডায়পার, পানির বোতল, কোকাকোলার বোতল, টিস্যু পেপার... ইত্যাদি! আমি দেখেছি! এবং আমি এসব দেখে কান্না করেছি। এমন কেন হয় আপনারা কি জানেন?

এসব তখনই হয় যখন আমরা রীতিনীতিগুলি পালন করার সময় মূলনীতির সাথে এসবের সম্পর্কের কথা ভুলে যাই। মূলনীতির কোনো ধার ধারি না আমরা। যেসব মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এসব ইবাদত করি সেই উদ্দেশ্যগুলোকেই এসব ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। এর ফলে, অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতিগুলোকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে যেই দ্বীন সুন্দর হওয়ার কথা ছিলো, সেটা আজ হয়ে গেছে কদাকার ও অপরিচ্ছন্নতার প্রতীক। আর এভাবেই আমরা একটা সুন্দর ধর্মকে কদাকার করে ফেলেছি। ঠিক বনী ইসরাইলরা যেরকম করেছিল। তাঁরা আল্লাহর দেয়া সুন্দর ধর্ম থেকে মূল জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু রীতিনীতিগুলোকেই গ্রহণ করেছিল, যার ফলে সে ধর্মটিও কদাকার হয়ে গিয়েছিলো। সুবহানাল্লাহ!

আমার কাছে তাই এই কাঠামোটি ভালোভাবে বুঝতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান মনে হয়েছে। এর ভেতর থেকে যদি বড় কিছু শেখা যায় তাহলে আমাদের সেই সেই সুযোগটি নেওয়া উচিত। বর্তমান উম্মাহর মতভেদের কয়েকটি বড় বড় বিষয় হচ্ছে, তারাবির নামাজ কয় রাকাত হবে, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে কি সারা পৃথিবীতে একইদিনে ধরা হবে নাকি এলাকাভিত্তিক হবে। এইসব হচ্ছে বড় বড় তর্কের বিষয়। কিন্তু আপনারা যদি মূল ফিকাহ'র বইপত্রগুলো দেখেন তাহলে বুঝবেন যে এইসব বিষয় এমনকি তিন নম্বর বৃত্তের মধ্যেও এগুলো নেই! এগুলো হচ্ছে চার বা তার-ও পরের বিষয়। তাহলে কেন আমরা এসব নিয়ে তর্ক করছি? যেসব বিষয় আমাদেরকে সংঘবদ্ধ করে, ঐক্যবদ্ধ রাখে সেগুলো চেয়ে আমাদের মধ্যে যেগুলো বিভক্তি ঘটায় সেগুলোই অনেক বেশি শক্তিশালী।

কিন্তু আমরা যখন যেসব বিষয় আমাদেরকে সংঘবদ্ধ করে সেসব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেই, তখন বিভক্তি সৃষ্টি করার বিষয়গুলোই আমাদের চোখের সামনে চলে আসে। এমনকি এখনকার দিনেও একজন মুসলিম যখন আরেকজন মুসলিমকে দেখে তখন মনে মনে চিন্তা করে, সে কি শাফেয়ী নাকি মালিকী? সে কি আমার মতো?

কিছু কিছু মানুষ আমাকে এসে বলে যে তারা পাকিস্তানী, তাই তারা আমাকে পছন্দ করে, কারণ আমিও পাকিস্তানের। আমিও তখন বলি যে, ও আচ্ছা, তাই? আমিও আপনাকে পছন্দ করি। এরপরে তারা বলে, আপনি তো হানাফী, তাই না?

- আমি হানাফী হলেও সেটা আপনাকে বলবো না।

- কেন? বলবেন না কেন?

- আমি আপনাকে বলতে চাই না, কারণ আপনার তো এটা নিয়ে চিন্তাই করা উচিত নয়। আপনার তো শুধ এইটুকুই চিন্তা করা উচিত যে সে কি মুসলিম নাকি মুসলিম না? ব্যাস, এইটুকুই যথেষ্ট।

যাইহোক, চলুন আরেকটু সামনে আগাই।

নীচের বিষয়টি শাইখ আকরাম নাদভীর সাথে আমার প্রথম ক্লাস। ক্লাসটি আমার কাছে খুবই কল্যাণকর মনে হয়েছে। আমি আপনাদেরকে এখন সেটাই বলবো যেটি উনি একদম শুরুতে বলেছিলেন। আর এটাই হবে এখনকার শেষ বিষয়। এটা আমার শোনা সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। তিনি বললেনঃ

আল্লাহ তা'য়ালা মোট কতজন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন?

- ১ লাখ ২৪ হাজার।

- পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারা?

- নবী-রাসূলগণ। এ বিষয়ে তো আপনার সবাই একমত, তাই না?

- মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম শিক্ষক কারা ছিলেন?

- এই ১ লাখ ২৪ হাজার নবী-রাসূলগণই হচ্ছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বোত্তম শিক্ষক। সবাই একমত?

- ঠিক আছে, তাদের নাম বলুন এবার।

- উম...আ...।

- কেন? কি হলো? তারা তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ! আপনার তো তাদের নাম জানা উচিত!

- আল্লাহ তো তাদের সবার নাম বলেন নি। আল্লাহ মাত্র ২৫ জনের কথা আল-কুর'আনে উল্লেখ করেছেন।

- তার মানে কি? অল্প কয়েকজনের নাম বাদ পড়েছে? তাঁরা ছিলেন ইসলামের সবচেয়ে বড় শিক্ষক, অথচ আমরা তাঁদের নাম পর্যন্ত জানি না!!!

আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে আবু হানিফা কে ছিলেন, কে ছিলেন ইমাম শাফেয়ী। অযথা চিন্তা বন্ধ করুন।

আমি (উস্তাদ নোমান আলী খান) যদি এটা বলতাম তাহলে কোনো বিষয় ছিল না। কিন্তু যখন বিশ্বের সকল হানাফী মাযহাবের স্কলারদের মধ্যে অন্যতম একজন সেরা আলেম শাইখ ড. আকরাম নাদভী তার বক্তব্যের শুরুতে এরকম একটা কথা বলেন, তখন আমিও অনেক অবাক হয়েছিলাম।

তিনি বলেছিলেন, এ বিষয়ে কিছু শেখার আগে আমাদেরকে আগে সবকিছুর অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে। এই কারণেই তিনি নবীদের এই প্রসঙ্গটি দিয়ে শুরু করেছিলেন। এখন এই বিষয়ে আমার শেষ কথা। এগুলো ছিল তাঁর বক্তব্যের শুরুর কথা, যেগুলো আমি সবার শেষে বলেছি। এখন

মুসলিমদের চিন্তা-চেতনা কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে আমার নিজস্ব সর্বশেষ মতামত বলবো। আমি এটা জানি, কারণ আমার মাথাও একসময় এইভাবে কাজ করতো।

আমরা যখন ছোটবেলায় ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতাম, মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরণের গল্প শোনানো হতো আমাদের। যেমন, বড় কোনো আলেম এরকম দো'আ করেছিল, যার কারণে এইরকম এইরকম হয়েছিল ...অথবা নবী রাসূল এবং সাহাবীদের নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা, বা কোন কাজ করলে কত সওয়াব হবে, আর কোন কাজ করলে কি পরিমাণ গুনাহ হবে, কি ধরণের শাস্তি হবে - এই ধরণের কথাবার্তা আমরা সারাজীবন শুনে আসছি। এসব জিনিসের কিছু এসেছে আল-কুর'আন থেকে, কিছু সুন্নাহ থেকে, আর কিছু বিষয় কোথা থেকে এসেছে সেটা কেউ জানে না। কিন্তু আমাদের মাথায় এসব একসাথে মিলেমিশে 'মিক্স সালাদ' এর মতো হয়ে গেছে। আর এই মিশ্রণটাকেই আমরা ইসলাম হিসেবে মনে করি।

এখন, আমাদের কি আলাদা করা উচিত ছিল না যে কোনটি আল্লাহর নির্দেশ, কোনটি নবীর শিক্ষা? এসব বিষয় অন্য বিষয়গুলোর সাথে না মিশিয়ে আলাদা করে রাখা কি উচিত ছিল না? এই বৃত্তগুলো আঁকার উদ্দেশ্য কি ছিল? উদ্দেশ্য এই যে, যখন আপনারা ইসলাম নিয়ে চিন্তা করবেন, তখন প্রাথমিকভাবে প্রথম তিনটি বৃত্ত নিয়ে ভাববেন। আর এর বাইরে অন্যকিছু যখন শুনবেন, তখন সেটাকে এই তিন বৃত্তের বাইরে অন্য যে বৃত্তগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে থেকে সঠিক বৃত্তটি বেছে নিয়ে সেখানে বসিয়ে নিবেন।

আর যদি কোনো কারণে, চার থেকে ছয় নম্বর বৃত্তের কোনো কিছু নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে একমত না-ও হই তাহলেও কিছু যায় আসে না। সেটা আমাদেরকে বিভক্ত করবে না। সেটা আমাদের উম্মাহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে না। উম্মাহ'র ঐক্য হচ্ছে এক, দুই এবং তিন নম্বর বৃত্তের মধ্যে।

আমাদের সবার একই ফিকহ থাকতে হবে এমন নয়। আমাদের সবাইকে যে বিতর সালাত একই নিয়মে পড়তে হবে এমনও নয়। আমাদের সবার তারাবীর নামাজের রাকাত সংখ্যা যে সমান হতে হবে তা-ও নয়। আমাদের সবকিছু একইরকম করতে হবে না। সব বিষয়ে আমাদের ফতোয়া একইরকম হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এসব আমাদের কে বিভক্ত করবে না। দুই ভিন্ন দিনে ঈদের সালাত আদায় করলে আমরা বিভক্ত হয়ে যাবো না। কারণ আমরা আরো শক্তিশালী কিছু বিষয় দ্বারা ঐক্যবদ্ধ।

কিন্তু যখনই আমরা সবগুলো বৃত্তের সবকিছুকে একসাথে করে ফেলি তখনই বিভক্তি শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ হওয়ার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে কোন বিষয়গুলোকে প্রকৃত অর্থে অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য দিতে হবে সেটা সঠিকভাবে বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সোর্স বইঃ প্রশান্তির খোঁজে

মূলঃ উস্তাদ নোমান আলী খান

প্রকাশকঃ বুকিশ পাবলিশার

যোগাযোগঃ +8801645261821

FB: https://www.facebook.com/bookishpublisher/

e-mail: bookishpublisher@gmail.com